ভারতীয় রেল ম্যাপে আজও উপেক্ষিত জলপাইগুড়ি

নতুন নতুন হাইওয়ে ধাবা: বাইরে খাওয়ার অভ্যেস বাড়ছে ডুয়ার্সে

শুরু হল নতুন ক্রাইম থ্রিলার 'শালবনে রক্তের দাগ'

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ নভেম্বর ২০১৭। ১২ টাকা

ayurveda

The Science Of Life

Divyaur®

PHARMAKRAFT®
Crafting Wellness

Launching

Ayurvedic Range of Products

Divyaur® (A Division of PHARMAKRAFT®)

PHARMAKRAFT THERAPEUTICS PVT. LTD.

For Distributorship Please Call : 8697773093 (10.30 am to 6 pm)

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

চা-শিল্পের বই

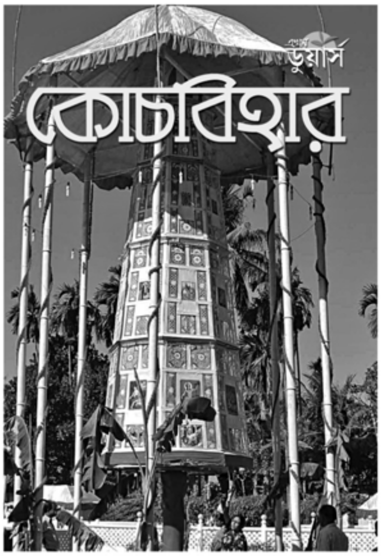

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

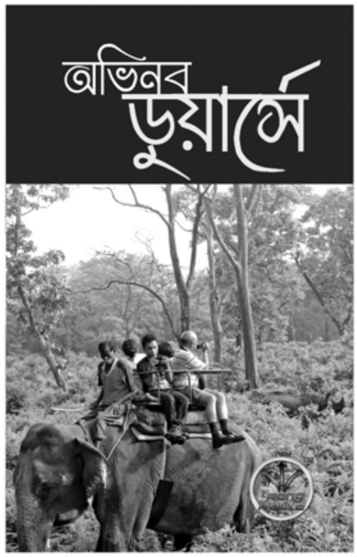

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

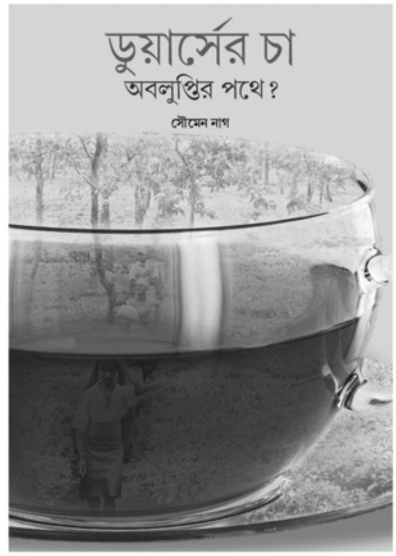

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

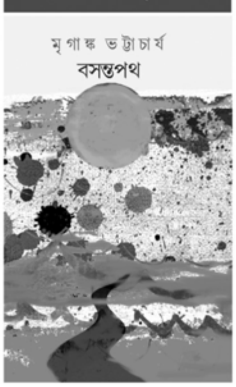

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

সম্পাদকের ডুয়ার্স

মানুষের মিলন উৎসব রাসমেলা

লৌকিক ধর্ম বেশিরভাগ সময়ই কোনও শাস্ত্রীয় আচার-বিচার, বিধিনিষেধ মেনে চলেনি। সাধারণ মানুষের নিজস্ব আচার-বিচারেই তা পালিত হয়। কোচবিহারের মদনমোহনেরও তেমনই শ্রীরাধিকা ছাড়া রাসোৎসবে মেতে উঠতে আটকায়নি। আর উৎসব ঘিরে মানুষের অংশগ্রহণ সে তো পারস্পরিক মিলনের কারণে। তাই রাস উৎসব উপলক্ষে মেলা বছর বছর ব্যাপ্তি পেয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মেলায় ভিড় জমিয়েছে। বদলও ঘটেছে অনেক। কিন্তু সে বদল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

রাজ-অনুগ্রহেই যে এই মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, ধর্মীয় আনুগত্য থেকেই যে তার সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে মেলার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। এখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন কিংবা রাধিকাবিহীন মদনমোহনের ধর্মীয় ব্যাখ্যার থেকেও মানুষের মিলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে মেলার বাইরের চেহারার বদলের থেকেও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল তার যুগোপযোগিতা।

বছর চারেক হল কোচবিহার রাসমেলায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তিনশো স্কোয়্যার ফুটের স্টল হয়। যেখানে ছবিতে-ভাষায় তুলে ধরা হয় পশ্চিমবঙ্গের নিসর্গ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। নিজের রাজ্যকেই ঠিকঠাক জানার সুযোগ পায় না ডুয়ার্সের মানুষ— তাই এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন দুশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটি ঘিরে পর্যটন দপ্তরের বাজেট এবং কর্মসূচি এর চেয়ে বাড়ানো হচ্ছে না কেন? বিষ্ণুপুর মেলা যখন এত আড়ম্বরে করা সম্ভব হচ্ছে তখন কোচবিহার রাসমেলা নয় কেন? নিদেনপক্ষে খবরের কাগজে বা হোর্ডিং-এ কয়েকটি বিজ্ঞাপন তো প্রকাশ করে গোটা বাংলার মানুষকে জানানোর শুভ দায়িত্বটুকু পালন করতে পারতেন আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তর!

দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু নতুন মেলা বা উৎসব যদি সরকারি উদ্যোগে শুরু হতে পারে, তবে উত্তরবঙ্গ উৎসব তো রাসমেলাকে ঘিরেই হতে পারত? পর্যটনপ্রেমী দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যদি এসময় উত্তরবঙ্গে ভিড় জমাত তবে একই বাংলার দুই প্রান্তের মানুষের ভাবনা-সংস্কৃতির আদানপ্রদান সম্ভব হত। ভাওয়াইয়ার সঙ্গে মিশে যেত বাউলের সুর। বঞ্চনা ও অবহেলার মানসিক যন্ত্রণা থেকে খানিক হলেও মুক্তি পেত ডুয়ার্সের মানুষ। এটা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

চতুর্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা,
১-১৫ নভেম্বর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
প্রচ্ছদ নিবন্ধ
ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৮
চাহিদা যথেষ্ট থাকলেও ভারতীয় রেল ম্যাপে আজও উপেক্ষিত জলপাইগুড়ি ১৩
পর্যটকের ডুয়ার্স
জঙ্গলে প্রথমবার ২২
উত্তরপক্ষ ৩৮
বাইরে খাওয়ার অভ্যেস বাড়ছে ডুয়ার্সেও
কোচবিহারের কড়চা
অবহেলার পুরনো পাঁকে পদ্ম ফুটবেনা তো? ৪৩
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৭
শালবনে রক্তের দাগ ২৭
তরাই উৎরাই ৩২
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৪
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪১
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৫
শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬

প্রচ্ছদ ছবি: তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সমস্যা শোণিতে

জমা জলের ধারে ‘ডিম পাড়া নিষিদ্ধ’ লিখলেই যে মশারা কথা শুনবে এমন নয়। ফলে সেই জ্বর (যে জ্বরের নাম করতে নেই) দিব্যি জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। শিলিগুড়িতে এ নিয়ে থমথমে ভাব। গম্মেন্টের লোকেরা নাকি ডাক্তারদের বলছে, এইডস, কলেরা, ডিপ্লোকক্কাস— যা খুশি বলুন। খবরদার! সেই নামটি উচ্চারণ করবেন না। ওদিকে পাবলিক সর্দিজ্বর হলেও নিষিদ্ধ জ্বর বলে টেনশনে পড়ে যাচ্ছে। তা এহেন সময়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে নাকি অ্যানিমিয়া ধরা পড়েছে। মানে ব্যাঙ্কে রক্ত নেইকো। ত’বিল এক্কেবারে জিরো! সরকারি-বেসরকারি— সকলেরই ভাঁড়ার শূন্য। পাবলিক যে উদ্যোগ নিয়ে রক্তদান শিবির বসাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার জন্য যত বীর নাগরিক রক্ত দেবে বলে মিছিলে-ফেসবুকে জানিয়েছিল, তার পরমাণু শতাংশও আসছে না শিবিরে। ফলে অ্যানিমিয়া অব্যাহত। এই শুনে শিবিরের কেউ কেউ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে যে, ব্লাডের প্লাবন বয়ে যাবে। কিন্তু গম্মেন্ট পারবে অত ব্লাড জমা নিতে? ব্যাঙ্কের সিন্দুকে জায়গা বাড়ন্ত— জানেন না?

এক পায়ে

নিম্নচাপের মানসিকতা খুবই নিম্ন। নয়ত কালীপুজোর কালে ডুয়ার্সে হানা দেওয়ার কারণ কী? টুরিস্টদের তো নাকানিচোবানি হলই, তদুপরি কোথাও আলোর তোরণ মুখ থুবড়ে পুজোর কর্তাদের মুখে আঁধার, কোথাও মণ্ডপের ছাদ উড়ে দেবী কালিকা কাকভেজা, কোথাও বাঁশ চাপা পড়ে ঘায়েল টোটোচালক! এরপরেও পাবলিক হাসি হাসি মুখে ভাইফোঁটার বাজার করতে গিয়ে দেখে ধনেপাতার কিলো চারশো টাকা! তবে জলপাইগুড়ি নার্সিং হস্টেলের দিদিমণিরা ধান, দুব্বো, শাঁখ, প্রদীপ, মিষ্টি নিয়ে দল বেঁধে ফোঁটা দিতে বেরিয়ে দেখেছেন, ভাইয়েরা সব আক্ষরিক অর্থে ‘এক পায়ে খাড়া’! না না! নিম্নচাপ কিংবা ধনেপাতার দাম শুনে ভাইয়েরা অমন ভঙ্গিতে স্ট্যাচু হয়ে পড়েছিল এমনটা নয়। আসলে তারা সবাই গাছ ছিল কি না। দু’পেয়ে গাছ আর কোথায় জন্মে। আসলে দিদিমণিরা গাছকে ভাই পাতিয়ে ফোঁটা দিয়েছিল। ডুয়ার্সে গাছেরা বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ হয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই।

বরাহতাশ

বরাহ নিয়ে আবার হতাশ হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি টাউনের পাবলিক। শহরে ঘুরে বেড়ানো বরাহরা পুরাণের বরাহ অবতারের জিন বহন করছে কি না— এ নিয়েও গবেষণা শুরু হয়েছে চায়ের দোকানে, আড্ডাঘরে। মাসখানেক আগেই নাকি বরাহদের গ্রেপ্তার করার জন্য হাসিমারা এয়ারবেস থেকে সুখোই সমেত র‍্যাফ বাহিনী

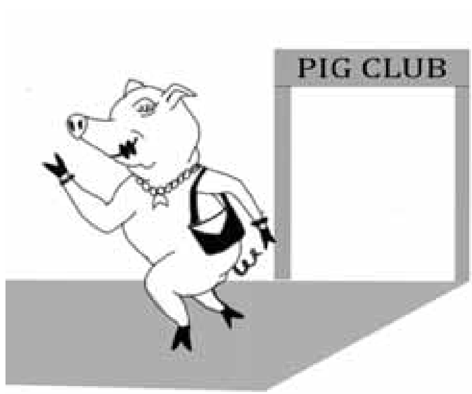

আনার কথা ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত, রহস্যময় শক্তির প্রভাবে একটা সিভিক পুলিশও নামেনি ময়দানে। বরাভয়প্রাপ্ত বরাহরা তাই পুরনাগরিকের স্টাইলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে গপ্পগুজব চালিয়ে যাচ্ছে। গেরস্তের সাজানো বাগানে পটি করে আসছে। দেখে সবাই মহা উত্তেজিত! পুরপতি রেগে আগুন! কিন্তু বরাহকে ‘টাচ’ করে কার সাধ্যি? টাউনকে বরাহশূন্য করে যাওয়ার মহাপ্রতিজ্ঞা করে চাটুজ্জে কাউন্সিলর বেশ আশা জাগিয়েছিলেন সেবার— তিনিও আর জোর পাচ্ছেন না গলায়। তাই বরাহে হতাশ টাউনের পাবলিক ভাবছেন, বরাহদের জন্য একখানা জম্পেশ মন্দির বানাবেন চাঁদা তুলে। সেটাই ভাল। বরাহ অবতারকে কি কেউ ধরতে পারে রে পাগলা!

বাম হাতি

নকশালবাড়ি এলাকার হাতিরা বরাবর একটু বেশি বিচ্ছু। মনে হয়, নকশালবাড়ি শব্দটা তাদের উত্তেজিত করে। সম্প্রতি বিশ গন্ডা (হ্যাঁ কাকা! ঠিক শুনেছেন! আশিটাই!) হাতি সেখানে যা করছে তা বাংলা ভাগের চক্রান্ত না সদন্ত বিপ্লবী আন্দোলন, সে নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন। নেপালে এখন মাওবাদীদের কদর নেই। সীমানায় বেড়া দিয়েছে বলে মাওবাদী হাতিরাও সে দেশে যেতে পারছে না। সে কারণেই নাকি নকশালবাড়ি এলাকার গ্রামে ঢুকে ধান-ভুট্টা লুঠ করছে। যেভাবে গম্মেন্টের লোকজনদের ঘোল আর নাগরিকদের খাবি খাওয়াচ্ছে, সেটা দেখলে গুরুং-বাহিনীও লজ্জা পাবে। নেহাত দার্জিলিঙে হাতি নেই। নইলে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নকশালবাড়িকে নির্ঘাত নিয়ে নিত এদ্দিনে। পুলিশ নাকি জানিয়েছে তারা অসহায়। তাদের আইনে চারপেয়ে বিচ্ছিন্নবাদীদের নিয়ে কিছু লেখা নেই।

মাউস ক্লিক

বাড়িতে এটা-ওটা চুরি করে পালায়। খাবারদাবার সাবাড় করে। বইপত্তর কুচি কুচি করে— না হয় এসব মেনে নেওয়া গেল। মাউস হয়ে গেরস্তের বাড়িতে যেখানে-সেখানে ক্লিক করবি, সে তো তোর জন্মগত অধিকার! তা-ই বলে পরলোকের পথে ক্লিকাস কেন রে হতভাগা! এমনিতেই শিলিগুড়িতে একখানা মোটে বৈদ্যুতিক শবদাহ যন্ত্র। ক’দিন আগে সেটা থেকে এমন ধোঁয়া বার হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলি যে, পাবলিক চিতাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে প্রায়। তারপর বয়লার-চিমনি সারিয়ে সব যখন ঠিকঠাক করা হচ্ছে, তখন তদন্তে ধরা পড়ল কী? তোরা চুল্লির তলাটাও কামড়ে ধসিয়ে দিয়েছিস! নেহাত গণেশের বাহন বলে কিছু বললুম না! ফের যদি চুল্লির দিকে দাঁত বাড়িয়েছিস, ফের যদি সেখানে ক্লিক করেছিস, তবে কিবোর্ড দিয়ে এমন পেটাব না, যে মাউসগিরি বেরিয়ে যাবে!

বাজারের তাপে

কোচবিহারে নাকি এমন হচ্ছে। বাজার থেকে ফেরার পর পাবলিক কিছুক্ষণের জন্য ভোলে ব্যোম হয়ে যাচ্ছে। তখন হার্ডকোর পদ্মপ্রেমী বলছে, দিদির মতো লোক হয় না! টকটকে

কমিউনিস্ট বলছে, আহা! মোদিই হল আসল বিপ্লব। ঘাসফুলের ভায়েরা বলছে, চৌতিরিশ বছরেই যা কাজ হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে যে, উৎসবের কাল ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও কোচবাজারে নাকি ফুলকপি-টম্যাটোরা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে চলেছে। লংকা-বেগুনরাও সেঞ্চুরি করে করে। বাজারের তাপে তাই পাবলিকের বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। বাজার-ফেরত পাবলিকের হার্ট পরীক্ষার জন্য অনেকেই ইসিজি মেশিন কিনে ছাতা টাঙিয়ে বসবেন বলে ছক কষছেন। এটাও জানা যাচ্ছে যে, জনৈক ব্লাড শুগারের বাজারু করলার দাম শোনার পর রেগে আগুন হয়ে মিষ্টির দোকানে ঢুকে কড়াপাকের চমচমের অর্ডার করেছেন খাবেন বলে। তবে সবই শোনা কথা। কিন্তু এটাও আবার ঠিক যে, বাজারে ঢুকে সবজিতে হাত দিয়ে ছ্যাঁকা খেয়ে আঙুলে বার্নল লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানোর লোক ইদানীং বেড়ে গিয়েছে কোচবিহারে। তাঁরা পকেটে হাত দিয়ে থাকেন, চোখে পড়ছে না— এই যা।

টুকরোণু

খেরকাটায় পথে আহত বাচ্চা হাতির সঙ্গে ধুন্ধুমার সেল্‌ফি তুলল পাবলিক। ঐতিহ্যকে সম্মান দিয়ে রাজগঞ্জের তিনটি বাড়িতে সিঁধ কেটে চুরি করল চোর। অপুষ্টি দূর করার কাজে ডাহা ফেল জলপাইগুড়ি জেলা। চোরাশিকারি আটকাতে পর্যটকদেরই যাওয়া স্টপ কোদালবাড়ির ওয়াচটাওয়ারে। বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছেন কালো ভালুক দম্পতি। খুচরো পয়সা দিয়ে কালীপ্রতিমা তৈরি ময়নাগুড়িতে— তারপর কী হবে, সে নিয়ে বেজায় কৌতূহল। বারবিশায় ৩১ ফুট কালী ঠাকুর ঘিরে ১১ দিনের জমজমাট মেলা। ভাতখাওয়া চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতন লুঠ। ডুয়ার্সে গন্ডারদের নতুন নিবাস হবে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে। হবিবপুরে আজব জন্তু— হতে পারে বাঘ। ফানুস ওড়াতে গিয়ে নারকেল গাছে আগুন ধরালেন ময়নাগুড়ির গেরস্ত। 'দীপাবলি রাতে/ মুরগি ভাতে' শিরোনামে আলিপুরদুয়ারে লটারি খেলার প্রথম পুরস্কার ছিল আড়াই মন চাল, এক গন্ডা মুরগি আর পাঁচ লিটার সরষের তেল। ব্রহ্মপুত্রের ইলিশ জলপাইগুড়িতে অজস্র। ভাইফোঁটায় ডুয়ার্সে হিট 'কন্যাশ্রী' আর 'জিএসটি' সন্দেশ।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

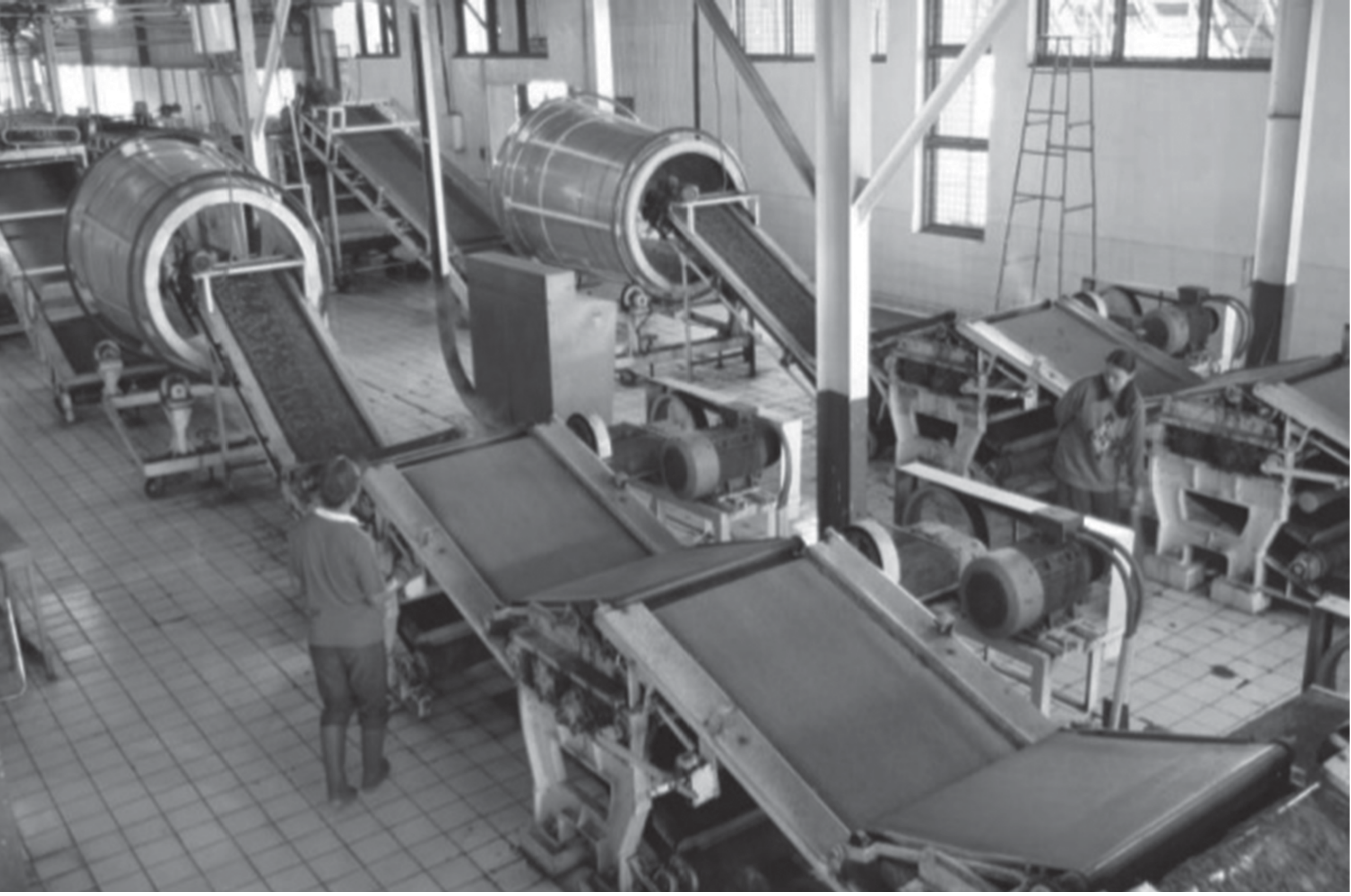

চা-পাতা তৈরির পুরনো মেশিন

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। সূচনা পর্বে একটি বাগান হলেও, আগামী সংখ্যা থেকে প্রত্যেক পর্বে থাকবে ৪-৬টি করে বাগানের পরিচিতি।

প্রথমেই সরাসরিভাবে বলে রাখা ভাল যে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সের যে জনপদ ও জনবিন্যাস এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা তা কিন্তু চা-বাগিচাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। তাই সংগত কারণেই আজ এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির যুগে বাগিচাশিল্পের পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই নিজেদের দায়কে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এই কারণেই যে, যেসব বহিরাগত শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার বিনিময়ে একদিন জঙ্গল কেটে বাগিচা স্থাপন এবং একের পর এক জনপদ গড়ে ওঠা— আজও তাদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারপক্ষ, রাজনৈতিক দলগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এত দোলাচলে কেন? কেন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-চিকিৎসা-খাদ্য-জীবনধারণের মৌলিক অধিকারগুলি থেকে তারা আজও বঞ্চিত? কেন সহজ-সরল আদিবাসী এবং নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে নিয়ে জাতপাতের বিভাজন ঘটিয়ে রাজনৈতিক জুয়া খেলা চলছে ডুয়ার্স এবং তরাইব্যাপী?

প্রশ্নগুলো একজন ইতিহাসের শিক্ষক তথা সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আমাকে নাড়া দিত প্রায়শই। বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নভাবে এই বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এর আগেও তুলে ধরেছি। বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে শিক্ষকতার বৃত্তিতে প্রবেশ করার প্রাক্‌লগ্নে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় যখন কর্মরত ছিলাম, তখন প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট-সহ বাগিচা শ্রমিকদের প্রতি শোষণ, অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শোষণ, মালিকপক্ষের সীমাহীন অমানবিকতা, এমনকি বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতাকেও গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করেছি সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে। তুলে ধরেছিলাম কিলকট চা-বাগিচার সেই বীভৎস শ্রমিক সংঘর্ষ এবং রক্তাক্ত অধ্যায়। রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগিচার ১৫ জন শ্রমিককে পুড়িয়ে মারার সেই বীভৎস দৃশ্যপট আজও চোখের সামনে উন্মোচিত। এই লেখা লিখতে বসে আজও চোখের সামনে ভাসে তারকেশ্বর লোহারদের মতো অত্যাচারী, শোষক শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জেহাদ। পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চোখ ওলটানো। এই জন্যই এ কথা উল্লেখ করা যে, সেই তারকেশ্বর লোহার কিছুদিন আগেই বীরপাড়াতে তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হলেন আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই, এবং খবরটা সংবাদপত্রের এক কোনায় সংক্ষিপ্ত আকারে ঠাঁই পেল এই জন্যই যে, তাঁর শ্রমিক শোষণের কুখ্যাতি আজও বীরপাড়া বা বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের চা শ্রমিকরা ভোলেনি। যদিও বীরপাড়া-মাদারিহাটের বাগানগুলোর জেলা ভাগের পর আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থান হলেও, দীর্ঘদিন ধরে এগুলি জলপাইগুড়ি জেলাতেই, যা ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্তও অবিভক্ত জলপাইগুড়ির অঙ্গীভূত। তাই আলিপুরদুয়ার জেলার প্রেক্ষাপটে ২০১৬-র অক্টোবর থেকে ২০১৭-র অক্টোবর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ২৪টি পর্বে 'ভীষ্মলোচন শর্মা' ছদ্মনাম ধারণ করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রতিক আলিপুরদুয়ার জেলার বাগানগুলির চিত্র পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি 'এখন ডুয়ার্স'-এর বিশেষ প্রতিবেদক হিসাবে। এবারে সীমিত সামর্থ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর আরোপিত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি জলপাইগুড়ির বাগিচাগুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন-জীবিকাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে।

প্রথমেই আমি সবিনয়ে বলে রাখি, এই লেখাগুলি কোনও গবেষণাপত্র নয়, নয় কোনও ডেস্ক টেব্‌লিং বা বই থেকে হুবহু টুকে দেওয়া কোনও থিসিস পেপারের অংশবিশেষ। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এই কাজটি আমি করতে নেমেছি সমাজমনস্ক একজন মানুষ হিসাবে, ইতিহাসের একজন শিক্ষক হিসাবে, একজন শ্রমিকদরদি হিসাবে, এবং 'এখন ডুয়ার্স' ডুয়ার্স নিয়ে সত্যিই ব্যথিত, চিন্তিত এবং ভাবিত। আমাদের প্রিয় ডুয়ার্স সর্বক্ষেত্রেই শোষিত, বঞ্চিত। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প এবং সর্বোপরি 'টি, টিম্বার, টোব্যাকো, টুরিজম এবং ট্রান্সপোর্ট'। তাই টি, টিম্বার, টুরিজমকে জলপাইগুড়ির প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব নিয়ে চলে যাবে আর উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক মানুষগুলি ভুখা পেটে

চা পাতি ওজন হচ্ছে বাগানে

> আমাদের প্রিয় ডুয়ার্স সর্বক্ষেত্রেই শোষিত, বঞ্চিত। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প এবং সর্বোপরি 'টি, টিম্বার, টোব্যাকো, টুরিজম এবং ট্রান্সপোর্ট'। তাই টি, টিম্বার, টুরিজমকে জলপাইগুড়ির প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

থাকবে, চায়ের ফুল, কচু গাছের কন্দ, পিঁপড়ের ডিম, নুন-ভাত বা শাক-ভাত খেয়ে থাকবে আর অপুষ্টিতে মারা যাবে— এটা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলতে দেওয়া যায় না। তাই আগেই বলেছি, আমাদের সকলের দায় ও দায়িত্ব, যাদের জীবন ও জীবিকার বিনিময়ে ডুয়ার্সের জনপদ গড়ে ওঠা, আমাদের সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে ওঠা, তাদের প্রতি আমাদের কোনও দায়িত্ব থাকবে না— এটা হয়? আমি যেহেতু সমাজমনস্ক একজন লেখক তাই শ্রমিকদের কষ্ট, যন্ত্রণা বা চা-শিল্পে যদি সত্যি কোনও সমস্যা থাকে, সেটাকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা— এটাই আমাদের দায় ও দায়িত্ব। এই দায় এবং দায়িত্ববোধ নিয়েই 'এখন ডুয়ার্স'-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে লম্বা পথপরিক্রমা।

অনেকেই হয়ত ভাবতে পারেন, এত ভণিতা করার কী প্রয়োজন? প্রয়োজন এই কারণেই যে, পরবর্তী লেখা থেকে আমি সরাসরি চলে যাব বাগিচা বিষয়ক আলোচনায়। তাই প্রথম সংখ্যায় আমার বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বলে না দিলে পাঠকবর্গের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। কারণ ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে থাকে নীরস তথ্যের কিছু কচকচানি, এবং বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করতে পারি না। তাই নীরসতার মধ্যেও সরসতার কিছু উপাদান, কিছু তথ্য, কিছু ইতিহাস, কিছু বিনোদন তো রাখতেই হবে। কারণ আমি আগেই বলেছি, এ কোনও গবেষণাপত্র নয়, এ হল আমার পথপরিক্রমার বিবরণ। আমার কাজের মূল্যায়ন করবেন সাধারণ পাঠকবর্গ, যাঁরা নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' পড়েন। সেই কারণেই তথ্যবিকৃতি বা তথ্যবিভ্রান্তি হলেও গঠনমূলক সমালোচনা সবসময়েই স্বাগত। কারণ অভিজ্ঞতা থেকেই তো মানুষ শেখে। আলিপুরদুয়ার জেলার উপর কাজ করবার সময়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা বা সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই ধরনের কাজ করার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যে মানুষগুলির সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছি তা তো আগে কখনও পাইনি। এই অভিজ্ঞতা, এই সহযোগিতা তো এবারে পথ চলার ক্ষেত্রে আমার বাড়তি প্রাপ্তি। কারণ আমাকে সরাসরিভাবে মূল্যবান

কৈলাসপুর যাওয়ার পথে গজলডোবা ব্যারেজ

পরামর্শ দিয়ে গাইড করছেন আমার অতি প্রিয় শিক্ষক তথা বিশিষ্ট পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শিক্ষারত্ন আনন্দগোপাল ঘোষ, যিনি অত্যন্ত আনন্দিত চা-শিল্পের উপর এই ধরনের ধারাবাহিক কাজ 'এখন ডুয়ার্স' করছে বলে। চা-বিজ্ঞানে যে ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতার কোনও সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই শ্রদ্ধেয় রাম অবতার শর্মা, যিনি টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স ব্রাঞ্চের সম্পাদক, তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান এবং উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের উপর তাঁর প্রজ্ঞা ও সুগভীর পাণ্ডিত্য আমার মতো শিক্ষনবিশ এক লেখককে অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার শ্রদ্ধেয় সুমন্ত্র গুহঠাকুরতা তাঁর ব্যস্ততার মাঝখানেও প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন বিগত লেখাগুলোর ক্ষেত্রেও। হয়ত এবারে পথ চলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাব আরও বহু বিশিষ্টজনকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আইটিপিএ-র অমিতাংশু চক্রবর্তী, যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং চা-শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনকানুন, শিল্প পরিচালনাগত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের অতীতের মতো এবারেও সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা আশা রাখি। তাই দুর্জয় সাহস, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আর উত্তরবঙ্গের প্রতি ডুয়ার্সের অবহেলার বিরুদ্ধে সোচ্চারিত প্রতিবাদ হিসাবে, ডুয়ার্সের আদি-অকৃত্রিম এই শিল্পের প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে জেহাদ হিসাবেই দীপাবলির পুণ্যলগ্নে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে ধাবমান হওয়ার লক্ষ্যেই শুরু করলাম পথ চলা। লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী—গজলডোবা থেকে গোপীমোহন। অর্থাৎ ১৮৭৪-এ গজলডোবা থেকে ১৯৩০-এর শেষ চা-বাগান গোপীমোহন, যা অবশ্য বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায়।

১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্সে জলপাইগুড়ি চা-শিল্পের আত্মপ্রকাশ এবং বাণিজ্যিক যাত্রাপথ শুরু গজলডোবাকে কেন্দ্র করে। ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স বা পশ্চিম ডুয়ার্সে জে আর হাউটন গজলডোবাতে প্রথম টি এস্টেট স্থাপন করলেন। ১৮৭৪ সালে গজলডোবা চা-বাগিচা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করলে একে একে ফুলবাড়ি, ডালিমকোট, বাগরাকোট, কুমলাই, ডামডিম, ওয়াশাবাড়ি, এলেনবাড়ি, মানিহোপ, পাতাবাড়ি, রানিচেরা বাগানগুলো বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু করল। মাল, মেটেলি এবং নাগরাকাটা থানাকে কেন্দ্র করে চা-বাগিচাগুলি গড়ে ওঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই। মাল মেটেলি এবং নাগরাকাটা প্রতি ইউরোপিয়ান চা-করদের ছিল পাখির চোখ, কারণ এই অঞ্চলে চা-শিল্প স্থাপনের জন্য ছিল অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ। কালক্রমে গজলডোবা চা-বাগানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় তিস্তা নদীর করাল গ্রাসে। তাই ডুয়ার্সের প্রথম প্রতিষ্ঠিত গজলডোবা চা-বাগিচা এখন স্মৃতি। কিন্তু গজলডোবাকে কেন্দ্র করে এখন চলছে টুরিজম বা পর্যটনের বিরাট কর্মকাণ্ড। বাকি যে অংশটুকু রয়েছে, সেটিরও নামের রূপান্তর ঘটেছে কৈলাসপুর টি এস্টেট নামে।

তিস্তার পশ্চিম পাড় থেকে হিমালয়ের পাদদেশে সুবিস্তৃত বনভূমি এলাকা, তরাই অঞ্চল এবং তিস্তার পূর্ব পাড় থেকে হিমালয়ের পাদদেশের এলাকা পরিচিত ডুয়ার্স নামে। ডুয়ার্স শব্দের অর্থ ডোর বা দুয়ার। ডুয়ার্স শব্দের আভিধানিক অর্থ কিন্তু ভৌগোলিক মানচিত্রে পাওয়া যাবে না।। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরবঙ্গ নামেরও কিন্তু সরকারি স্বীকৃতি নেই, সরকারি প্রশাসনেও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক বা দেশীয় মানচিত্রে ডুয়ার্সের অস্তিত্ব না থাকলেও বাণিজ্যিক পথ বা আঠেরোটি প্রবেশদ্বারের সূত্র ধরে উত্তরের ভূখণ্ড ডুয়ার্স নামেই পরিচিতি লাভ করল আমাদের মননে এবং তা সর্বজনস্বীকৃত হল মুখে মুখেই। তিস্তা নদীর পূর্ব পাড় থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড পরিচিত হল ডুয়ার্স রূপে। ভুটান থেকে সমতলে আসার জন্য ঘন জঙ্গল ও দুর্গম পাহাড়ে ঢাকা

পথগুলি ছিল ভারত ও ভুটানের প্রবেশদ্বার বা দুয়ার। ভুটান রাজ্যের সঙ্গে বর্তমান উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ডের সমতল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিস্তা ও সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী পাঁচটি পথ ছিল জলপাইগুড়ি জেলায়। ইংরেজ কোম্পানির শাসকরা ভুটান সীমান্তে তাদের প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করলে সরকারি নথিপত্রে ডুয়ার্স কথাটা ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভব করল। ফলে ভূখণ্ডটি ডুয়ার্স নামেই পরিচিতি লাভ করল।

চা-বাগিচাশিল্প শ্রমিক এবং জমিনির্ভর। এই শিল্পের জন্য জমি এবং শ্রমিক একে অপরের পরিপূরক। তাই বাংলার অন্য জেলাগুলির জন্য প্রযোজ্য ভূমি আইন দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকায় প্রয়োগ করা হল না। এই দুই অঞ্চলকে ঘোষণা করা হল নন-রেগুলেটেড এরিয়া। চালু হল ওয়েস্টল্যান্ড রুল। এই ওয়েস্টল্যান্ড রুল অনুযায়ী জমিকে পতিত ঘোষণা করে তাকে চা-বাগিচা স্থাপনের জন্য মালিকের হাতে নামমাত্র দামে তুলে দেওয়া হতে লাগল। পশ্চিম ডুয়ার্সে ডঃ ব্রুহাম গজলডোবায় প্রথম যে চা-বাগিচা স্থাপন করেছিলেন, তার অস্তিত্ব আজ আর নেই। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল ডুয়ার্সে চা-বাগিচা শিল্পের অগ্রগতির ইতিহাস। চা-বাগিচাগুলির মালিকানার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুই ধরনের চরিত্র। এ দু'টি হল ব্যক্তিমালিকানা এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বা অংশীদারিত্ব। লিমিটেড কোম্পানির চা-বাগিচা ছিল দুই ধরনের। একটি রুপি কোম্পানি এবং অপরটি স্টার্লিং কোম্পানি। যে সমস্ত চা-বাগিচার রেজিস্ট্রেশন হত ভারতে, সেগুলি ছিল রুপি কোম্পানি। যে সমস্ত বাগিচার রেজিস্ট্রেশন হত ইংল্যান্ডে, সেগুলি ছিল স্টার্লিং কোম্পানি। যেহেতু চা-বাগিচার মালিকরা অধিকাংশই ছিল ইউরোপিয়ান তাই দার্জিলিঙের চা-বাগিচাগুলিসহ অধিকাংশ চা-বাগিচাক্ষেত্রই স্টার্লিং কোম্পানি ছিল। ডুয়ার্সের বেশির ভাগ বাগানই ছিল রুপি কোম্পানি।

চা-বাগিচা স্থাপনের লক্ষ্যে জমিবণ্টনের উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ হয় না অর্থাৎ আবাদহীন জোতজমি এবং জনবসতিহীন অঞ্চলের জমিগুলিকে ওয়েস্টল্যান্ড রুলের আওতায় আনা হয়। তৎকালীন দার্জিলিং জেলা ও ডুয়ার্সের এক বিশাল অঞ্চল ওয়েস্টল্যান্ড রুলের আওতায় এলে জমি বণ্টিত হতে থাকে। 'ওয়েস্টল্যান্ড রুল' অনুযায়ী জমিগুলিকে আগে পতিত জমি বলে ঘোষণা করা হত এবং পরবর্তীকালে জমিগুলিকে নিলামে তোলা হত। নিলামব্যবস্থার মধ্যেও ছিল ফাটকাবাজি, কারচুপি বা আগাম বন্দোবস্তের ব্যবস্থা। কারণ বাগিচা স্থাপনের নামে নামমাত্র মূল্যেই ইউরোপীয়রা জমি হস্তগত করে সেগুলি অনেক বেশি দামে চা কোম্পানিকে বিক্রি করে দিত। এইভাবে ফাটকাবাজির মাধ্যমে দার্জিলিঙের চা-বাগিচাগুলি প্রায় বিনামূল্যে এইসব জমির অধিকারী হয়েছিল। ডঃ ব্রুহাম পার্বত্য অঞ্চলে চা-বাগিচা স্থাপন করেছিলেন। তিনিই এবার জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স এলাকায় বাগিচা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে সমতলে চা-বাগিচা প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করলেন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। রাজ্যের ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ অন্য যেসব আইন চালু ছিল, তার আওতা থেকে চা-বাগিচার জন্য জমিবণ্টনের লক্ষ্যে দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স

> চা-বাগিচাশিল্প শ্রমিক এবং জমিনির্ভর। এই শিল্পের জন্য জমি এবং শ্রমিক একে অপরের পরিপূরক। তাই বাংলার অন্য জেলাগুলির জন্য প্রযোজ্য ভূমি আইন দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকায় প্রয়োগ করা হল না। এই দুই অঞ্চলকে ঘোষণা করা হল নন-রেগুলেটেড এরিয়া। চালু হল ওয়েস্টল্যান্ড রুল।

এলাকাকে বাইরে রেখে চালু করা 'ওয়েস্টল্যান্ড অ্যাক্ট'-এর সুযোগকে ডুয়ার্সেও সম্প্রসারিত করা হল।

ওয়েস্টল্যান্ড বলতে ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ জলাজঙ্গল, আবাদি চাষবিহীন পতিত জমিকে বোঝায়, যেখানে চাষের সুযোগ ও সম্ভাবনা খুবই কম। সিদ্ধান্ত হয়, চায়ের জন্য গৃহীত ওয়েস্টল্যান্ডের লিজের পরিমাণ ১৫০০ একরের বেশি হবে না। চা-চাষের জন্য জমি নিলে তার জন্য খাজনা দেবার আইন পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা হয়। ডুয়ার্সের এই ওয়েস্টল্যান্ড অ্যাক্টে ডঃ ব্রুহাম ১৮৭৪ সালে গজলডোবায় চা-বাগিচা স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গঞ্জ, গঞ্জ থেকে শহর গড়ে ওঠার ফলে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটল। এই এলাকা জনশূন্য ছিল না। গজলডোবার জঙ্গলমহলে বসবাস করত মেচ, রাভাদের মতো আদিবাসীরা। ঝুমচাষের মাধ্যমে এরা উৎপন্ন করত চাল এবং তুলো। ডুয়ার্সের নিম্ন অঞ্চলে স্থায়ী চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত হত চাল, সরষে, তামাক এবং নানা প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য, যার অধিকাংশই ভুটানে যেত কর হিসাবে। গজলডোবার আদি অধিবাসী মেচরা এখান থেকে উৎখাত হয়ে আসামসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। ওয়েস্টল্যান্ডগুলো ছিল সরকারি খাসজমি। খাসজমি বণ্টনের সুযোগ চলে যাবার পর প্রথম দিকে জোত বা চাষযোগ্য জমিতে চা-চাষের অনুমতি দেওয়া না হলেও, পরবর্তীকালে জোতজমিতেও চা-চাষের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম চা-বাগানের পত্তন হয় গজলডোবায়। বাগানটি বারে বারেই তিস্তার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ওদলাবাড়ি টি কোম্পানির কাছ থেকে কৈলাসচন্দ্র রাহুত গজলডোবা চা-বাগানটি কিনে নেন। বারবার তিস্তার বন্যায় বাগানটি ভাঙতে থাকলে কৈলাসচন্দ্র বাগানটি দি ফ্রেন্ডস টি কোম্পানি লিমিটেডকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বিক্রি করে দেন। ক্রয়মূল্য দিতে না পারায় মামলায় জিতে রাহুতরা পুনরায় ওই বাগান ফিরে পান। ওই পরিবারের কামিনীকান্ত রাহুত বাগানটির মালিকানা পেলে তাঁর নিজস্ব অবদানে সম্পূর্ণ বাগান গড়ে ওঠে এবং গজলডোবার নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় কৈলাসপুর চা-বাগান। কামিনীবাবু চমৎকার এবং দক্ষ চা-কর ছিলেন। কৈলাসপুর গড়ার সময় তিনি তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা সেখানে প্রয়োগ করেন। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের অন্তর্গত গজলডোবা ডুয়ার্সের আদি চা-বাগান। শতবর্ষ আগে তিস্তার দুই পারে ছিল গভীর, গহন, গা-ছমছমে জঙ্গল। আকাশ-ছোঁয়া শালবন, নানা প্রকার বনজ সম্পদ, লতাপাতা, তন্তুজালে ঢাকা। জঙ্গলের ভিতর ছিল বিভিন্ন প্রকার ভেষজ। সেবক রোড ধরে কিছুটা এগলেই শুনশান। দু'পাশে দেবদারু, পাইন, আম, কাঁঠাল, ঘন বাঁশবন। শালুগাড়া অতিক্রম করলেই যখন-তখন বাঘ, হাতি, লেপার্ডের দল।

অরণ্যপথে জঙ্গল ভেদ করে গেলে সরস্বতীপুর চা-বাগান। এখানে-ওখানে ঝোপেঝাড়ে শেয়ালের গর্ত। কোথাও সবুজ মাঠ, রাশি রাশি বনফুল, চুকাই। জলাশয়ে, গাছের কোটরে, ডালপালায় পাখিদের ডাকাডাকি। সরস্বতীপুর হয়ে গজলডোবা। তখন ব্যারেজের সৃষ্টি হয়নি। প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে বিখ্যাত লেখক, পরিব্রাজক এবং উদ্ভিদপ্রেমী স্যার জোশেফ ডালটন হুকার গজলডোবা ছুঁয়ে লালটং, চুমুকডাঙি, ঘোড়ামারার দুর্ভেদ্য বৈকুণ্ঠপুর বনভূমি পরিক্রমা করেছিলেন। সরস্বতীপুর চা-বাগান নিয়ে যখন সার্ভের কথা লিখব, তখন প্রসঙ্গক্রমেই আসবে পৌনে দু'শো বছর আগেকার গজলডোবার হুকারের চোখে দেখা দৃশ্যপট।

গজলডোবা ব্যারেজ

কৈলাসপুর টি এস্টেট

মালবাজার মহকুমার অন্তর্গত কৈলাসপুর টি এস্টেট জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য নাগরিক এবং বনেদি রাউত পরিবারের পরিচালনাধীন দি ফ্রেন্ডস টি কোম্পানি লিমিটেড-এর অন্তর্গত। ১৯৪৪ সালে তাঁরা বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ডিবিআইটিএ এবং আইটিপিএ যুগ্মভাবে বাগানটিকে পরিচালনগত পরামর্শ দেয়। কোম্পানির হেড অফিস বাবুপাড়ার রাহুত বিল্ডিং-এ। বর্তমানে রাহুত পরিবারের পিকে রাহুত বাগানটির মালিক। ম্যানেজারের সংখ্যা ১২ জন। সিনিয়র ম্যানেজার মানস ভট্টাচার্য।

বাগিচায় ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা তিন। স্বীকৃত তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন হল সিবিএমইউ, ডিসিবিডব্লিউইউ এবং ডব্লিউবিসিএমএস। করণিক ৩ জন, সাবস্টাফ ৬৬, ক্লারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ২ জন। বছরে বাগানে গড়ে ৩৩ লক্ষ কেজি নিজস্ব চা-পাতা উৎপাদিত হয়। নিজস্ব উৎপাদিত চায়ের গড় বাৎসরিক হিসাব সাড়ে পাঁচ লক্ষ কেজি। বাৎসরিক গড় হিসাবে কেনা চা-পাতা থেকে তৈরি চা সাড়ে চার লক্ষ কেজি। মোট বাৎসরিক তৈরি চা ১০-১১ লক্ষ কেজি। কোম্পানির লিজ হোল্ডারদের নাম দি ফ্রেন্ডস টি কোম্পানি লিমিটেড। লিজের সময়কাল ২৫.০৭.২০৩২ পর্যন্ত। ইনঅর্গ্যানিক চরিত্রের এই চা-বাগানটি সিটিসি এবং গ্রিন টি উভয় ধরনের চা প্রস্তুত করে। ব্যাঙ্ক অব বরোদার কাছ থেকে বাগানটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ বাগানটির ফিনানশিয়াল পার্টনার ব্যাঙ্ক অব বরোদা।

বাগানে ৫৮৫টি শ্রমিক পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৩৫৫০ জন। স্থায়ী শ্রমিক ৬৫৭ জন। অস্থায়ীভাবে বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিক ৭৫০ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ বা ওয়ার্কমেন ৯৭। স্থায়ী শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পায়। নয়া গিনতি অনুযায়ী গড়ে ৫০ জন অন্যান্য কর্মীসংখ্যা। বাগিচায় অশ্রমিক ২৬৯২ জন। এটি কমবেশিও হতে পারে। বাগিচায় মোট শ্রমিক আবাস ৫৭২। পাকা বাড়ি ৩৫৩, সেমি পাকা বাড়ি ৪২, অন্যান্য বাড়ি ১৭৭, সর্বমোট ৫৭২। বাসগৃহের শতকরা হিসাব ৬৭ শতাংশ। বাসগৃহ নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় খরচ ৪ লক্ষ। শ্রমিকদের জন্য পায়খানা ও শৌচাগারের সংখ্যা ৩৬৫। বাগিচায় বিদ্যুতায়ন হয়েছে '৯৮ সালে। শ্রমিক আবাসে বিদ্যুৎ পৌঁছানো বাড়ির সংখ্যা ৩৫৩, বিদ্যুৎ সংযোগহীন বাসগৃহ ২১৯।

কৈলাসপুর চা-বাগিচা প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট-এর সব ক'টি নিয়ম নিখুঁতভাবে পালন করে। বাগিচায় সমৃদ্ধ হাসপাতালে মেল ওয়ার্ড ৪টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৬টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৪টি, আইসোলেশন ওয়ার্ড ৬টি। এমনকি অপারেশন থিয়েটারও আছে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও আছে। বিগত বছরগুলিতে রেফার করা রোগীর গড় সংখ্যা ২৫০। আবাসিক ডাক্তারের নাম ডাঃ প্রদীপ চক্রবর্তী। অলটারনেটিভ মেডিসিনে তিনি এমবিবিএস। তাঁর ডিগ্রি এএমসিসি দ্বারা স্বীকৃত। বাগিচায় নন-ট্রেন্ড নার্স আছেন ৩ জন, কম্পাউন্ডার ১ জন, হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ১ জন, মিডওয়াইভস ১ জন। ডাক্তার অনুমোদিত ওষুধের ব্যবস্থা, ডায়েট চার্ট অনুসারে গুণগতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়। পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে।

কৈলাসপুর চা-বাগিচায় আছেন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। ২০.০৭.২০১১ তারিখে রাজীবকুমার দে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে যোগদান করেছেন। বাগিচায় শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিন আছে। তবে ভরতুকি দেওয়া হয় না। সবসময় সবকিছু পাওয়া যায় না। ভ্রাম্যমাণ ক্রেশ-এর সংখ্যা ১টি। ক্রেশ-এ ল্যাট্রিন ও টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের দুধ দেওয়া হয়। পোশাকও সরবরাহ করা হয়। ক্রেশ-এ পরিচারিকার সংখ্যা ২ জন। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। কৈলাসপুর চা-বাগানে একটি ট্রাকে বাগিচার শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা হয়। বাগিচায় বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ দুইই আছে।

শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ কৈলাসপুর চা-বাগিচার গত পাঁচ বছরের গড় বাৎসরিক খরচ ৩৭ লাখ। পিএফ, মজুরি, র‍্যাশন, মজুরির এরিয়ার, জ্বালানি-কম্বল, ছাতা-চপ্পল— কোনও কিছুই বকেয়া নেই। বিগত চার বছরে গ্র্যাচুইটি প্রদানের গড় হার ৩২ লক্ষ টাকা। বিগত চার বছরে গড়ে ৯৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়েছে। কারও বকেয়া নেই। বাগিচায় শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাসের হিসাবে ৪১ লাখ টাকা গড়ে বোনাসের জন্য প্রদান করা হয়।

চাহিদা যথেষ্ট থাকলেও ভারতীয় রেল ম্যাপে

আজও উপেক্ষিত জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সার্বিক মাস্টার প্ল্যান আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারল না ভারতীয় রেল। কত সরকার এল-গেল, কত মন্ত্রী বদল হল— কিন্তু ছিটেফোঁটা অর্থ বরাদ্দ বা দু'-একটি করে নতুন ট্রেন বরাদ্দ করা ছাড়া যাত্রী পরিষেবার মান উল্লেখ করার মতো নয়। বিভিন্ন স্টেশনের উন্নতিকল্পে যাত্রীরা সময়ে সময়ে সোচ্চার হলেও তা উপেক্ষিত। এই দাবির সমর্থনে রাজনৈতিক দলগুলো সোচ্চার হয়েছে কখনও স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে, কখনও রেলের বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে দাবির সমর্থনে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে রেল মন্ত্রীর কাছেও। তবে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত শতাব্দীপ্রাচীন হলদিবাড়ি স্টেশনটির উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে। তিনটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হত অতীতে। এখন একটিমাত্র প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়। প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হলেও লম্বায় একই রকম আছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাইরে চলে যায়। একটিমাত্র রেল গেট বন্ধ হয়ে গেলে শহরের দু'টি অংশের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি মেল ট্রেন হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হোক। পুরনো প্ল্যাটফর্মগুলো সক্রিয় করে ওভারব্রিজ তৈরি করা। স্টেশন থেকে মাসে ২০ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি বাবদ রেলের আয় হলেও হলদিবাড়ি স্টেশনের যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য রেলের উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

তবে ভিন্নধর্মী তথ্যও পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এনজেপি এরিয়া অফিস থেকে। রেলের নিয়ম মোতাবেক একটি স্টেশনের উন্নতির জন্য প্রথমেই দেখা হয় কতজন যাত্রী টিকিট কাটছেন, যাত্রীরা সকলেই টিকিট কাটলে পরিষেবা উন্নত করা হয়। এটাই রেলের নিয়ম। হলদিবাড়ি স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনে টিকিট সংরক্ষণ বাবদ ভালই আয় হয়। তবে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে টিকিট বিক্রির পরিমাণ খুবই কম। হলদিবাড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মোট তিনজোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল করে। দু'টি এক্সপ্রেস ট্রেন হলদিবাড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে। তার মধ্যে একটি দৈনিক এবং একটি সপ্তাহে তিন দিন চলাচল করে। তিনজোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রতিটিতে ১২টি কামরা থাকে, প্রতিটি কামরায় ১০৮

জন বসে যেতে পারে। প্রতিটি ট্রেনে যেখানে ১২৯৬ জন বসে যেতে পারে, সেখানে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে মাত্র ১০০-১২০ জন যাত্রী প্রতিটি ট্রেনে টিকিট কেটে ওঠেন। হলদিবাড়ি থেকে কোনও মালগাড়ি চলে না বলে পণ্য পরিবহণ বাবদ রেলের আয় হয় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সব স্টেশনে টিকিট বিক্রির হার বাড়লেও হলদিবাড়ি স্টেশনে টিকিট বিক্রির হার তুলনায় কমেছে। বাস্তবিক, হলদিবাড়ি স্টেশনে যাত্রী গাড়িগুলোতে খুব কম সংখ্যক যাত্রী টিকিট কাটেন বলে গাড়ি চালাতে রেলের আয়ের বদলে ক্ষতি হয়। বেলাকোবা, আমবাড়ি কিংবা ফালাকাটা স্টেশনে হলদিবাড়ি থেকে অনেক বেশি যাত্রী টিকিট কাটেন বলে ওইসব স্টেশনের উন্নতি হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দেখা যায়, রেলগাড়ি এলেই টিকিটবিহীন যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে প্রাচীর টপকে বেরিয়ে আসছেন। এই টিকিটবিহীন যাত্রীদের সংখ্যা টিকিটযুক্ত যাত্রীর সংখ্যার থেকে অনেক গুণ বেশি। ফলে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রুটে যেসব ট্রেন চলছে, সেই ট্রেনগুলো থেকে রেল বিভাগ উপযুক্ত আয় করতে পারছে না। রেলগাড়িতে এই যে বিশাল সংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করছে, তার প্রতিফলন কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না।

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দেখা যায়, রেলগাড়ি এলেই টিকিটবিহীন যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে প্রাচীর টপকে বেরিয়ে আসছেন। এই টিকিটবিহীন যাত্রীদের সংখ্যা টিকিটযুক্ত যাত্রীর সংখ্যার থেকে অনেক গুণ বেশি। ফলে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রুটে যেসব ট্রেন চলছে, সেই ট্রেনগুলো থেকে রেল বিভাগ উপযুক্ত আয় করতে পারছে না। রেলগাড়িতে এই যে বিশাল সংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করছে, তার প্রতিফলন কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। ফলে রেলের আধিকারিকরা জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রুটের যাত্রীদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় মাঝেমধ্যেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন। কাটিহার ডিভিশনের উদ্যোগে দার্জিলিং মেলের হলদিবাড়ি পর্যন্ত কোচগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে জলপাইগুড়ি শহরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, টিকিট কাটার তথ্য যেহেতু সঠিকভাবে রেল বিভাগের কাছে উঠে আসে না, তাই রেল বিভাগও এই অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে এনে রেল বিভাগকে আর্থিকভাবে মজবুত করতে পারে না। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ির যাত্রীদের উচিত ন্যায্য মূল্য দিয়ে রেলযাত্রা করা। সড়কপথে যে মূল্য যাত্রাপথের জন্য দিতে হয়, এই রুটে রেলযাত্রার জন্য তার চেয়ে অনেক কম মূল্য দিতে হয়। সঠিক মূল্য দিয়ে টিকিট কেটে যাত্রা করলে রেল বিভাগের কাছে এই রুটের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাবে। তখন এই রুট নিয়েও রেল বিভাগ গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করলে তার সুফল পাবে এই এলাকার যাত্রীরাই।

দার্জিলিং মেল-এর সংযোগরক্ষাকারী শিয়ালদহের উদ্দেশে বিকেলে যাওয়া এনজেপি পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিতে আরও সংরক্ষিত কামরা দেওয়া উচিত, যাতে হলদিবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি থেকে এখানকার মানুষ নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসে রেলযাত্রা করতে পারে। দুপুরবেলা হলদিবাড়ি থেকে শিয়ালদহগামী তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস শুধুমাত্র অতিশয় মন্থরগতির নয়, ট্রেনটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশও ভাল নয়। সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি যাতায়াতের অযোগ্য। সবজির বস্তা নিয়ে যারা মালদা বা আজিমগঞ্জ যায়, তারা হলদিবাড়ি থেকে বসার জায়গা নিজেরা দখল করে নেয়, আর ট্রেনের ভিতরের যাতায়াতের রাস্তায় বস্তাসহ অন্যান্য জিনিস রাখা থাকে। অসহায় যাত্রীরা, যারা সংরক্ষিত কামরার টিকিট পায় না, তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে।

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ততম স্টেশন। স্টেশন সবসময় জমজমাট থাকে। লোকে লোকারণ্য থাকে স্টেশনটি। কিন্তু এই স্টেশনের পিছনের মাছবাজারসহ নর্দমার দুর্গন্ধে ট্রেনযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। সবসময় স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ভরে থাকে দূষিত দুর্গন্ধে। স্টেশনের পাম্প হাউসের পাশে মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করায় ওই স্থানটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রীরা নাকে রুমাল ঢেকে যাতায়াত করে। ট্রেনের যাত্রীসাধারণ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এই দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ চাইছে। স্টেশন বাজারের মাছ বাজারের অপরিষ্কার জল যাতে বড় ড্রেন বা নালাগুলোতে জমতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নালাগুলো সবসময় সচল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। স্টেশনের পাম্প হাউসের পাশে মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী এলাকাগুলোতে নিয়মিত জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে টাউন স্টেশনের ট্রেনযাত্রীসহ সাধারণ মানুষ যে কিছুটা হলেও দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ উপহার পাবে— এ কথা জোর গলায় বলা যায়।

শতাব্দীপ্রাচীন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনটিকে অবহেলা করা সঠিক বিচার নয়। নতুন রেল লাইন স্থাপন করার জমি রয়েছে টাউন স্টেশনে। রেল ইঞ্জিন কারখানা তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত জমিও রয়েছে, সেই জমিতে দোমোহানির বন্ধ রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা গড়ে উঠতে পারে। রেলের জমিতে তৈরি হতে পারে ট্রেনিং সেন্টার। ভারতের রেলকর্মীরা এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে। একটি শেড তৈরি করার জায়গা আছে এই স্টেশন চত্বরে। রেলের কার্যালয় বা পার্সেল বুকিং অফিস গড়ে উঠলে স্থানীয় কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হতে পারে। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নতি হলে তিস্তা-তোর্সা ট্রেনটি এখান থেকে ছাড়তে পারবে, আলিপুরদুয়ার থেকে একটি নতুন ট্রেন চলতে পারে শিয়ালদহ পর্যন্ত। তা ছাড়াও দিল্লিগামী এবং দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন চালু করা যেতে পারে। হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট প্রতিদিনই যাতায়াত করতে পারবে। এনজেপি-র উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য দার্জিলিং মেল জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়তে পারবে।

কোনও জায়গার উন্নতি ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যোগাযোগব্যবস্থা। রেল যোগাযোগ হল কোনও অঞ্চলের জীবনরেখা। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন দিয়ে রাজধানীসহ অনেক দূরপাল্লার ট্রেন যাতায়াত করে, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ট্রেনই স্টেশনে দাঁড়ায়। গৌহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ বা গরিব রথের মতো ট্রেনগুলোর রোড স্টেশনে দাঁড়ানো উচিত, যাতে এদিককার যাত্রীদের এনজেপি দৌড়াতে না হয়। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে সাধারণ টিকিট কাউন্টার দু'টিতে টিকিট কাটতে দীর্ঘ লাইন দিতে হয়। স্টেশন চত্বরে নোংরা আবর্জনায় যাত্রীদের নাভিশ্বাস ওঠে। স্টেশনের ওভারব্রিজটি অত্যন্ত দুর্বল, যেখানে বয়স্করা উঠতে ভয় পায়। প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে অপর একটি প্ল্যাটফর্মে সারমেয় এবং শূকরের মলমূত্রে স্থানটি অতিশয় দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। তাই অতি

অবশ্যই টাউন স্টেশনের উন্নতি করা উচিত। বাংলাদেশের সঙ্গে যদি রেল যোগাযোগ গড়ে উঠত, তবে জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্ব বাড়ত। পদাতিক এক্সপ্রেসকে হলদিবাড়ি থেকে চালানোর দাবি বহু দিনের। হলদিবাড়ি থেকে দক্ষিণ ভারত বা চেন্নাইয়ের জন্য ট্রেন চালু করা প্রয়োজন, যাতে দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করাতে বা ঘুরতে যেতে ইচ্ছুক পর্যটকদের সুবিধা হয়। সর্বোপরি, টাউন স্টেশনের মান উন্নত করে যাত্রীদেরকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া উচিত।

বর্তমানে ভারতীয় রেল দেশের সর্বত্র ডবল লাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। তবু যেসব জায়গায় নানা কারণে এখনও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে বেলাকোবা থেকে জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত অংশটুকু রয়েছে। এ পথে ডবল লাইন পাতার প্রক্রিয়া চলছে। শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে রেল যোগাযোগব্যবস্থার দুর্বলতা বহুদিন ধরেই এই দুই শহরের নাগরিকদের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার হাল যত বেহাল হচ্ছে, ততই মানুষ রেল যোগাযোগব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কিন্তু রেল যোগাযোগব্যবস্থার দৈন্য যাত্রীদের হতাশাকেই বাড়িয়ে তুলছে। বিহারের বারৌনি থেকে কাটিহার হয়ে এনজেপি পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের সুযোগ উত্তরবাংলার মানুষ আগামী দিনে পেলে তা হবে অত্যন্ত আনন্দের এবং উচ্ছ্বাসের। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবাংলার মানুষরা এই দাবিগুলো নিয়ে সরব হয়েছিল। কাটিহার থেকে এনজেপি পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চালাবার প্রকল্পটিকে যদি সম্প্রসারিত করে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন পর্যন্ত অথবা হলদিবাড়ি পর্যন্ত করা হয় তাহলে যোগাযোগব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে। ছাত্রছাত্রী, অফিসযাত্রী, চিকিৎসাপ্রার্থী, ব্যবসায়ী—প্রত্যেকেরই যেমন সময় এবং অর্থ বাঁচবে, তেমনই যাত্রাপথও সহজ হবে। ফলে উত্তরবাংলার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শহরের যাত্রাপথ হয়ে উঠবে আরও নিকট। উত্তরবাংলার প্রশাসনিক রাজধানী জলপাইগুড়ি এবং অঘোষিত বাণিজ্যিক রাজধানী শিলিগুড়ির উন্নত রেল যোগাযোগব্যবস্থার সুফল পাবে উত্তরবাংলার প্রত্যেক নাগরিক।

জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ব দিকে তিস্তা নদীর অপর পাড়ে রয়েছে প্রাচীন বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে বা বিডিআর-এর পরিত্যক্ত স্টেশন ও রেলপথ। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের পূর্ব দিকে তিস্তার অপর পাড়ে ছিল বার্গিশিঘাট স্টেশন, যা ১৯৬৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় চাপা পড়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের দক্ষিণে অর্থাৎ হলদিবাড়ির দিকে যে আউটার সিগন্যাল আছে, সেটি জলপাইগুড়ির পিলখানা অঞ্চলের অন্তর্গত। সেখান থেকে একটি বাঁধ যদি তিস্তা নদীর দিকে এগিয়ে যায় তাহলে সরাসরি বার্গিশিঘাট স্টেশন যাওয়া যাবে শুধুমাত্র একটি রেল সেতুর যোগাযোগের মাধ্যমে। কেবলমাত্র তিস্তায় একটি সেতু নির্মাণ করা যায়। তাহলে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। এই যোগাযোগব্যবস্থায় খরচ এবং সময় দু'টিই কম লাগবে। তিস্তা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে রেল লাইন পাতলে এই পথে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের সঙ্গে যেমন ময়নাগুড়ি রোডকে যুক্ত করা যাবে, তেমনই চ্যাংড়াবান্ধা-যোগীঘোপার সঙ্গেও সংযুক্ত করা যেতে পারে, কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা ছাড়াই এবং অনেক কম সময়েও। এই রেলপথ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাপূরণ হবে, তেমনই ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ প্রান্তের সঙ্গে এই অঞ্চলের সংযোগ গড়ে উঠবে। স্থানীয় এলাকাগুলোর মধ্যে সহজে যাতায়াতের জন্য হলদিবাড়ি-বার্গিশি-মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি-বার্গিশি-ময়নাগুড়ি রোড-মালবাজার-শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি টাউন-হলদিবাড়ি চক্র রেলব্যবস্থাও গড়ে তোলা যেতে পারে— যা এই অঞ্চলের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করবে। কারণ নিউ চ্যাংড়াবান্ধা থেকে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু করা গেলে এবং যোগীঘোপা থেকে ময়নাগুড়ি রোড পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হলে ভবিষ্যতে এই রেলপথ হয়ে উঠতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যের যোগাযোগের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। হলদিবাড়ির সঙ্গে যদি মেখলিগঞ্জ এবং চ্যাংড়াবান্ধাকে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে হলদিবাড়ি কৃষিজ পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলে যাবে এবং চ্যাংড়াবান্ধার মাধ্যমে তা বাংলাদেশেও রপ্তানি করা যাবে। ফলে হলদিবাড়ির কৃষকের প্রভূত উন্নতি হবে। আসামের যোগীঘোপার দূরত্ব অনেক কম হওয়ার ফলে পরিকল্পিত এই রেলপথের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করা সম্ভব। এর ফলে হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি এবং মেখলিগঞ্জের মানুষজন দূরপাল্লার ট্রেনের সুবিধা পাবে। বর্তমানে হলদিবাড়ি এবং মেখলিগঞ্জের মধ্যে যে দূরত্ব আছে তা অনেকটা কমে যাবার ফলে জ্বালানি সাশ্রয় হবে, যা পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির যুগে লাভজনক পরিকল্পনা।

উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগব্যবস্থা এনজেপি-নির্ভর। এনজেপি স্টেশনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার ফলে নতুন ট্রেন পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আন্তর্জাতিকমানের এই স্টেশনটি। ফলে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রেলযাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। রানিনগর জংশন দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করলেও স্টপেজ

উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগব্যবস্থা এনজেপি-নির্ভর। এনজেপি স্টেশনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার ফলে নতুন ট্রেন পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আন্তর্জাতিকমানের এই স্টেশনটি। ফলে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রেলযাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। রানিনগর জংশন দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করলেও স্টপেজ নেই।

নেই। এই স্টেশনের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে শহর জলপাইগুড়ি। রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই শহর। জলপাইগুড়ি স্টেশনটিকেও রেল কর্তৃপক্ষ পকেট করে রেখেছেন। এনজেপি, রানিনগর জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের রেলের দ্বার রানিনগর জংশন। প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে অনেক ট্রেন চলাচল করে। ট্রেনগুলো থামার জন্যেই তৈরি হয়েছিল রানিনগর জংশন। কিন্তু স্টেশনটির উন্নতি করার লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেই রেল কর্তৃপক্ষর। ফলে পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি রেল পরিষেবা থেকে চির-উপেক্ষিত।

এনজেপি-র উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য রানিনগরে কারশেড করা উচিত। ফলে দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেস ইত্যাদি ট্রেন রানিনগর থেকে চলতে পারবে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো রানিনগরে স্টপেজ হলে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন যাত্রীরা উপকৃত হবে এবং পাশাপাশি এনজেপি-র চাপ কমবে। ফলে রানিনগর স্টেশনটিকে এনজেপি-র সম্প্রসারিত স্টেশন করা যেতেই পারে। রানিনগর জংশনের কাজ আরম্ভ হলে এনজেপি পর্যন্ত আরও লোকাল ট্রেন চলবে, এবং কলকাতা-দিল্লি বা চেন্নাইগামী নতুন ট্রেনও চলতে পারে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে। রানিনগর স্টেশনটিকে যদি মডেল স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করে উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলে জলপাইগুড়ি বা হলদিবাড়ির যাত্রীসাধারণের চাপের কথা বিবেচনা করে হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটিকে প্রতিদিন চালানো যেতে পারে।

ভারতের রেল মানচিত্রে জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহানি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। ব্রিটিশ আমলে দোমোহানি ছিল ভারতীয় রেলের অন্যতম কেন্দ্র। রেল ইঞ্জিন তৈরি করার কাজে সহায়তা করত এই অঞ্চল। দোমোহানিতে শুধু রেলের কারখানাই ছিল না, অনেক রেল দপ্তরের কাজও হত এই শহরে। সেই শহর আজ প্রশাসনিক ঔদাসীন্যে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। শহরটি ১৯৬৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। রেল কর্তৃপক্ষ পুনরায় রেলের দপ্তরগুলো চালু রাখার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করেনি বলে আজও অবহেলিত দোমোহানি। জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির মধ্যবর্তী একটি ছোট শহর দোমোহানি। বর্তমানের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অতীতে রেলওয়ে বিদ্যালয় ছিল। সেই বিদ্যালয় থেকে অনেক ভাল ছাত্র তৈরি হয়েছে, যারা পরবর্তীকালে ভারত সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। অতীতের আরপিএফ ট্রেনিং সেন্টার বর্তমানে প্রায় নিষ্ক্রিয়। সেই ট্রেনিং সেন্টারে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেলওয়ে কর্মীরা ট্রেনিং নিতে আসতেন। রেলের দপ্তর থাকার জন্য অনেক রেলের আবাসন গড়ে উঠেছিল এই শহরে। সেগুলো আজ বেদখল হয়ে গিয়েছে। দোমোহানিতে ছিল বড় রেলওয়ে হাসপাতাল। সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার-নার্সরা পরিষেবা দিতেন। ফলে রেল কর্মচারীদের পাশাপাশি দোমোহানির সাধারণ মানুষরাও স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতেন। হাসপাতাল বন্ধ হওয়াতে সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত শহরবাসী। রেলওয়ে কারখানা ঘিরে ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নত ছিল দোমোহানি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো। জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য শহরের থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসাবাণিজ্য, খেলাধুলা ইত্যাদিতে অনেক উন্নত ছিল দোমোহানি শহর। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তাহলে অতীত রেল দপ্তর দোমোহানি আজও তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারত।

উত্তরবঙ্গে শিল্প নেই বললেই চলে। এই রেলওয়েকে কেন্দ্র করে দোমোহানিতে গড়ে উঠতে পারে শিল্প। রেলওয়ের অনেক জমি এখনও পতিত রয়েছে এখানে। এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। কিছুটা হলেও উত্তরবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। শিল্প হলে আবার রেলওয়ে যোগাযোগব্যবস্থা হবে। এবং ভারতের সঙ্গে দোমোহানির নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে। যোগাযোগব্যবস্থার প্রতুলতাই সেই স্থানের উন্নয়নের সহায়ক হয়। সুতরাং রেল যোগাযোগব্যবস্থার সহজলভ্যতা সেই সুযোগ এনে দিলে উত্তরবাংলার মানুষ রেল কোম্পানির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। উত্তরবঙ্গে প্রস্তাবিত রেলপথ তৈরির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে স্টেশন, ওভারব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় বছরখানেক পেরিয়ে গেলেও এই পথে চলছে না একটিও ট্রেন। চ্যাংড়াবান্ধা, ভোটপট্টি, মালবাজার— এই সমস্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় রেল চলাচল শুরু হলে যাত্রীদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে একদিকে যেমন কম সময় লাগবে, অন্য দিকে যাতায়াত ভাড়াও কম লাগবে। চ্যাংড়াবান্ধা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেল চলাচল বাস্তবে আজ পর্যন্ত স্বপ্ন হয়েই রয়েছে। এই পথে প্রস্তাবিত ট্রেনগুলো চলাচল শুরু করলে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের যোগাযোগব্যবস্থা দৃঢ় হবে, অন্য দিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

গৌতম চক্রবর্তী

দেবপ্রসাদ রায়

’৮৫ সালে বোম্বের ধারাভি বস্তি দেখে এসে রাজীবজী লেখককে দশ হাজার দরখাস্ত দিয়ে বলেছিলেন ছেলেদের দিয়ে প্রসেস করাতে। উত্তরে লেখক জানিয়েছিলেন কাজটা করিয়ে দেবেন কিন্তু এই একই কাজ যদি মাঝে মাঝে করতে হয় তবে একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। রাজীবজীর সম্মতিতে গড়ে উঠেছে আজকের ‘আইকার্ড’ সংস্থাটি। ’৮৭ -র নভেম্বরে লেখকের জীবনে ঘটে গেল বিরাট বিপর্যয়। রাজীবজীর নির্দেশে স্বল্প সময়ের নোটিশে নাগপুর যেতে হয়েছিল এবং সেখানে এক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছ’মাসেরও বেশি সময় ঘরবন্দি থাকতে হয়েছিল লেখককে। আর এই দীর্ঘ অসুস্থতাই তার রাজনৈতিক জীবনের উত্তরণের পথে বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে।

।।পর্ব ৪৫।।

সিডনির পর মাঝে একবার ডেনমার্ক গিয়েছিলাম একটা ইন্টারন্যাশনাল পীস কনফারেন্স-এ। সে ট্রিপটা ফাঁকি দিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম কারণ এত মানুষ এত দেশ থেকে এসেছিল যে, কেউ কারও খবর নিতে আগ্রহী নয়, কেউ কোনও ভাষণ শুনতেও মনোযোগী নয়। শুধু বাংলাদেশ থেকে যেদিন তদানীন্তন আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন বলবেন বলে এসেছিলেন, সেদিন আমি ওনাকে মন দিয়ে শুনেছিলাম, কারণ একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে একজন বাঙালি বলছে, আমারও তো গর্বের বিষয়!

কোপেনহেগেনে ট্রিপোলি পার্ক বলে একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আছে। নানা ধরনের খেলা গোটা পার্কটা জুড়ে হতে থাকে, মায় সার্কাস পর্যন্ত। আমি রাস্তাটা চিনে গিয়েছিলাম। কনফারেন্সে লাঞ্চ পর্যন্ত থেকে, পার্ক ঘুরে সন্ধেবেলায় হোটেলে চলে আসতাম। একদিন মাঝরাতে আমার রুমের দরজায় কেউ নক করছে, আমি প্রথমে পাত্তা দিইনি। তারপর যখন দেখলাম থামছেই না, তখন বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেখি মধ্যপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী রাজেন জৈন। আমি তো অবাক। ও এখানে এল কী করে, আর আমি এ ঘরে আছি জানল কী করে? ও বলল, দাদা, দুনিয়া কাফি ছোটা হ্যয়। যব তুম্ হো তো ম্যয় খরচ্ করকে কামরা কিঁউ লু? এক কোণে মে পড়া রহুঙ্গা। আমি যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম, ও আমায় ২৫০ ডলার দিয়ে বলেছিল, ম্যয় আজই লওটা হুঁ। ইয়ে ডলার বচ গিয়া। আপ লে যাও, কাম আয়েগা। তাকে মানা করি কী করে।

আমার সিঙ্গল বেডেড রুমের সোফাটা দখল করে নিল। পরদিন সকালে বললাম, এসেছো যখন, তো চলো কনফারেন্সে যাই। ও বলল, ‘ইয়ে সব বকওয়াস হ্যায়। হম তো ঘুম ঘাম কে চলে যায়েঙ্গে।’

কিন্তু সবচেয়ে সম্মানের ট্রিপ ছিল ’৮৭ সালে ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি লিডার হয়ে যাওয়া। লিডার ছিলেন মার্গারেট আলভা। আমি ডেপুটি। আলাদা গাড়ি, আলাদা ইন্টারপ্রেটর, আলাদা ঘর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন শিল্পীর দল গিয়েছিল। আমার মূলতঃ কাজ ছিল সেমিনারগুলো অ্যাটেন্ড করা। কলকাতার একটি বাঙালি মেয়েও এই দলের ভেতর ছিল। মালতী সাহা। পরে কলকাতার ৩নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়েছিল। আমি সবার সঙ্গে মিশতাম বলে প্রায় সবারই দাদা হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা সেমিনারে ভাষণ শেষ করার সময় সুকান্তর ‘বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী, আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি। তারই সূত্রপাতের করেছি সাধন, হে সাথী আজকে রক্তিম অভিবাদন।’— চার লাইন ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে বলে খুব হাততালি পেলাম। নানা দেশের ডেলিগেট, যাঁরা সেমিনারটায় ছিলেন, তাঁরাও পরে খুব প্রশংসা করলেন।

প্রতিনিধিদলের সবার সঙ্গে এতটাই সখ্য হয়ে গিয়েছিল যে সদিয়া দলভী (পরে খুশবন্ত সিংয়ের সাথে থাকতো) আমার ঘরে এসে একদিন বলছে, ‘দাদা, আমি তোমার ঘরে একটু চেঞ্জ করি? আমার রুমমেট চাবি নিয়ে চলে গেছে।’

ও না বললেও আমি বাইরে করিডরে

গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাল লাগল এই ভেবে যে এ ক'দিনের পরিচয়েই ও দাদাকে এতটাই নিজের মনে করতে শুরু করেছে, যে নির্দ্বিধায় আমার ওপর এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে।

'৮৭ সালের দিনগুলো খুবই ঘটনাবহুল। রাজীবজী যখন ডেকে বললেন, ডি পি, যারা ট্রেনিং নিয়েছে কিন্তু কোনও পেশায় না গেলে টিকে থাকতে পারবে না, তাদের নিয়ে কী করবে? সবাই তো রাজনীতি করবে না। সত্যিই, '৮৬-র প্রোগ্রামটা কাউকে ঘরছাড়া করেনি। বরং প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর নিজের নিজের জেলায় গিয়ে জেলার সাধারণ সম্পাদকের পদ পেয়েছে। এটাও নজিরবিহীন ছিল যে, এআইসিসি-র এক নির্দেশে সারা দেশে ৭৯৯ জন নিজের নিজের জেলায় সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল।

কিন্তু যারা বাড়িঘর ছেড়ে দশ মাসের নামে দু'বছর করে অন্য জেলায়, অন্য রাজ্যে কাটিয়েছে, তারা তো না 'ঘরকা না ঘাটকা'। কারণ '৮৫-তে ২২ জন একসঙ্গে ৫ রাজ্যে বিধানসভার প্রার্থী হয়ে এক বিশাল শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। আর সবাই শঙ্কিত। কে কখন এসে বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার মতো ওপর থেকে মনোনয়ন নিয়ে চলে আসবে। তাই ওদের পুর্নবাসন জরুরি ছিল। আমার অনেকদিন ধরেই একটা সুপ্ত বাসনা ছিল, এদের যে শিক্ষা দেওয়া হল ও মাঠে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করল তার একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা থাকা দরকার। এবং নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রামের মানুষের কাজে, বিশেষতঃ গ্রামের যুব শক্তিকে অনুপ্রাণিত করে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত করতে পারবে। তারই পরিণতিতে নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বায়ত্তশাসিত চেহারা এবং '৮৭-তে ৮৫ জন প্রশিক্ষিত যুব কর্মীর সেখানে কর্মসংস্থান।

তার আগে '৮৫-তে আমার একটা অন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাজীবজী বোম্বের ধারাভি, এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি (slum) সফর করে এসে আমাকে ডেকে দশ হাজার দরখাস্ত দিয়ে বলেছিলেন, ডি পি, এগুলো তোমার ছেলেদের দিয়ে প্রসেস করাও। যে কাজগুলোর মেরিট আছে, সেগুলো করতে হবে। আমি বললাম, এটা আমি করে দিচ্ছি, কিন্তু এটাই যদি আমাকে মাঝে মাঝে করতে হয়, তবে একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। উনি বললেন, তুমি একটা নোট দাও। নোট পাঠালাম। দশ দিন পর অস্কার সাহেব জানালেন, ইউ ক্যান গো অ্যাহেড। রাজীবজী নোট ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। সেটাই আজকের 'আইকার্ড'।

আমার সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল উনি আমাকে বিশ্বাস করতেন। হয়ত সবসময় ঠিক বলতাম না, সব পরামর্শ গ্রহণ করতেন না, কিন্তু আমার ইনটেনশন নিয়ে ওনার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তার প্রমাণও একবার পেয়েছি।

চাণক্য সেন সে সময় একজন পরিচিত বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ওনাদের একটা বিদ্বজ্জনদের গোষ্ঠী ছিল। তারকুণ্ডে প্রাণ চোপড়া, চাণক্য সেন— 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' বলে একটা সংস্থা চালাতেন, ন্যায় মার্গে অফিস ছিল। ওনারা একদিন আমায় ডাকলেন, বললেন রাজীব গান্ধী খুবই অল্প বয়সে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, ওর একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক দরকার, আমরা সে কাজটা করতে রাজী আছি। তুমি রাজীবজীকে বলবে? আমি সম্মত হয়ে একটা অফিস নোট পাঠালাম। সাধারণত যে কোনও নোটের দশ দিনের ভেতর একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনও প্রতিক্রিয়া পেলাম না। আর চাণক্যবাবু প্রায়ই জানতে চাইছেন, কী হল? একদিন বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাজীবজী, আমার ওই নোটটা দেখেছেন? বললেন, ডি পি, দেখেছি, খোঁজও নিয়েছি, ওরা সব রাইটিস্ট লবির লোক। আমি তো রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। এর কোনও খেসারত আমাকে দিতে হবে না তো? কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিলেন।

আজ অনেকে বলতে লজ্জা পায় আমার কী সহযোগিতা এক সময় পেয়েছে। একটা সময় ছিল, প্রদ্যোত গুহ রোজ সকালে আমার জন্য এক প্যাকেট কিং সাইজ গোল্ড ফ্লেক নিয়ে এসে বসে থাকত কখন ঘুম থেকে উঠব। এআইসিসি-র অফিসে প্রায় নিয়মিতভাবে জেএনইউ-এর ছাত্র সংগঠনের সমস্যা নিয়ে হাজির হত ওম প্রকাশ মিশ্র। আমি কোনওদিন কেউ কোনও প্রতিদান দেবে ভেবে কারও কোনও কাজ করিনি। এই সময়েই বোরোলীন কোম্পানির মালিকের মেয়ে সোমা দত্ত শুটার হিসাবে অলিম্পিকে যেতে পারছিল না। সুদীপ এল ওকে নিয়ে। ক্রীড়ামন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাকে দিয়ে ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

সত্তরের দশকে পল্টুদার সঙ্গে মাঠে যেতাম। ইস্ট বেঙ্গল গ্যালারিতে বসে মোহনবাগানকে সাপোর্ট করতাম। ওরা একবার এসে ধরে বসল, বিএসএফ-এর উইংগার সুবীর সরকারকে এনে দিতে হবে। কাজটা কঠিন ছিল। এবং শিবরাজ পাটিলের মতো মন্ত্রীকে মানানো আরও কঠিন ছিল। তাও করে দিয়েছি। বুলু এল (সুখেন্দুশেখর রায়), ডাঃ জয়শ্রী রায় চৌধুরী ও অসীম দত্তকে নিয়ে। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে, কেন্দ্র যদি পাশে না দাঁড়ায়। মতিলাল ভোরা স্বাস্থ্য মন্ত্রী। তাকে দিয়ে ৫০ : ৫০ অংশীদারিত্বে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসপাতালটি বাঁচিয়ে দিল। এগুলো হতাশার অভিব্যক্তি নয়। কিন্তু দিল্লির দিনগুলোতে রাজ্যের সহকর্মীদের প্রয়োজনে কীভাবে পাশে দাঁড়িয়েছি, তা জানাবার অবকাশ পেয়ে শুধু জানিয়ে রাখলাম। কারণ সময় বড় নিষ্ঠুর। খুব তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়। আরও অনেকের কথা আছে। যা বলা যাবে না। কারণ বয়স প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে। তারা তখন আমাকে অনেক বড় ভেবে অনেক সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু আমি নিজেকে ছোট রেখেই তাদের সম্মান দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। কোথাও পেরেছি, কোথাও পারিনি। এমনকি কারও কারও জন্য বলতে গিয়ে রাজীবজীর বিরাগভাজনও হয়েছি। কিন্তু কাউকে অসম্মানিত হতে দিইনি।

এই সময়টাতেই বফর্স। হঠাৎ করে সুইস রেডিওর একটা খবর যেন এক ধাক্কায় রাজীবজীর ভাবমূর্তিটাকে ধূলিসাৎ করে দিল। আজ সবাই জানে, কোনও দুর্নীতি ছিল না। নতুন করে তদন্ত করেও কিছু প্রমাণিত হবে না। কিন্তু সংসদের বাইরে ও ভেতরে প্রতিদিন শুনতে হত— 'গলি গলি মে শোর হ্যয়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যয়।' আমার কষ্ট হত, এরকম দেবদূতের মতো মানুষটাকে 'চোর' বলছে। তাও সংসদের ভেতর। আমার পিছনেই চিমনভাই মেহেতা বসত। ভি পি সিং-এর দালাল। একদিন তখনও দল ছাড়েনি, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে রাজীবজীর বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছে। আমি থাকতে পারলাম না। পিছন ফিরে কাঁধের দু'পাশে দুই রদ্দা মেরে ওকে বসিয়ে দিলাম। পরের দিন নাজমাজী (ডেপুটি চেয়ারপার্সন) বললেন,

আজ অনেকে বলতে লজ্জা পায় আমার কী সহযোগিতা এক সময় পেয়েছে। একটা সময় ছিল, প্রদ্যোত গুহ রোজ সকালে আমার জন্য এক প্যাকেট কিং সাইজ গোল্ড ফ্লেক নিয়ে এসে বসে থাকত কখন ঘুম থেকে উঠব। এআইসিসি-র অফিসে প্রায় নিয়মিতভাবে জেএনইউ-এর ছাত্র সংগঠনের সমস্যা নিয়ে হাজির হত ওম প্রকাশ মিশ্র। আমি কোনওদিন কেউ কোনও প্রতিদান দেবে ভেবে কারও কোনও কাজ করিনি।

ডি পি, ক্ষমা চাও। আমি বললাম, আমি যা করেছি, ঠিক করেছি, বরং সদন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, বলে বেরিয়ে গেলাম। তাই বলে এটাই আমার ভাবমূর্তি ছিল না। নিকারাগুয়ার ওপর একদিন রাজ্যসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব এল। আজও রেকর্ড আছে। আমার পর যশোবন্ত সিং বলতে উঠে বললেন, এই আবেগঘন বক্তৃতার পর আমি জানি না, কোনও দাগ কাটতে পারব কি না। হাউস থেকে বাড়ি চলে এসেছি। ফোন এল নিকারাগুয়া এমব্যাসি থেকে। ওদের রাজদূত সদনে ছিলেন। আমার বক্তৃতা খুব ভাল লেগেছে। আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করতে চান।

অশোকা হোটেলের একটা ব্লক নিয়ে এমব্যাসি। ভেতরে গিয়ে বসবার পর রাজদূত এলেন। আমাকে বিস্মিত করে শাড়ি পরিহিতা একজন রমণী। নাম হালিমা সরকার। আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, নিকারাগুয়া আর আপনি! কিছুতেই মেলাতে পারছি না। জানা গেল, ওনার বাবা আসলে হুগলি জেলার লোক। মার্চেন্ট নেভিতে ছিলেন। পানামাতে ওনার মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। একজন কেবল ইংরেজি বলতে পারে, আর একজন কেবল স্প্যানিশ। তাও প্রেম হতে অসুবিধা হয়নি। বিয়ে করে নিকারাগুয়ায় সেট্‌ল করেছে। ড্যানিয়েল ওর্তেগা যখন গেরিলা যুদ্ধে রত, তখন ও অনেকদিন হালিমাদের বাসায় লুকিয়ে ছিল। তারই প্রতিদানে এই অ্যামবাসাডারশীপ। আর উনিও সময় বের করে হুগলি এসে পৈতৃক ভিটে দেখে গেছেন। জানালেন, বাবা আমাদের ভারতীয়ত্ব ধরে রাখতে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান শিখিয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ পরার অভ্যাস করিয়েছে। তাই আমরা ভাইবোনেরা এই দেশের সাথে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি।

।।পর্ব- ৪৬।।

'৮৭ সালে গরবাচভের রাশিয়ায় খোলা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ফলে আগের ট্রিপগুলোর মতো লোকগুলো এখন আর মেকানিকাল নয়। প্রাণ খুলে কথা বলছে। ক্ষোভ জানাচ্ছে। আমাদের যে গাইডটি ছিল (নাম মনে নেই) সে তো একদিন বলেই দিল, আমি মাত্র ১৩৫ রুবল মাইনে পাই। আমার এর থেকে অনেক বেশি পাওয়া উচিৎ, কিন্তু কাকে বলব। ফিরে আসাবার সময় আমি আমার দুটো শার্ট দিয়ে এসেছিলাম, কারণ জানি দেশে ফিরে আর কোনও দিন লাগবে না। সে যে কী খুশি হল, বলার নয়।

একটা ঘটনা বলার মতো। যেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে মস্কোর বৃহত্তম স্টেডিয়ামে, সকাল থেকে আকাশটা মুখ ভার করে আছে, আর টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি দোভাষীকে বললাম, আজ এত বড় অনুষ্ঠান আর আকাশটা কীভাবে ভয় দেখাচ্ছে। ও বলল, 'ডোন্ট ওরি, উই উইল শেল দ্য ক্লাউড অফ'— তার মানে?— আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ও একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'জাস্ট ওয়েট টিল ইভনিং।' পরে জেনেছিলাম বিমান থেকে কামান দেগে আকাশটাকে পরিষ্কার করে ঝকমকে নীল করা হয়েছিল। এখানে কি এভাবে বন্যাপীড়িত এলাকা থেকে মেঘরাশিকে খরাপীড়িত এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায় না? বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। কিন্তু হলে ফল ভাল হত।

> গাড়িটা হাইওয়ে ধরল। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখছি, দু'টি আসনের মাঝে আমি পড়ে আছি। পেছনের সিটটা উপড়ে পড়েছে। আর চালকের আসন ফাঁকা। কিছু লোক গাড়িটাকে ঘিরে জটলা করছে। আমি শুধু বললাম, আমি একজন এমপি, আমাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে চলো।

'৮৬-তে মোট ছ'টা বিভাগীয় শিবির করেছিলাম। তাবানগর, লিবাসপুর, পণ্ডিচেরী, মাইথন, গান্ধীনগর ও মালখানগঞ্জ, দিল্লি। এ প্রোগ্রামটায় অত হাঙ্গামা ছিল না। কারণ ওরা জেলা প্রশিক্ষক হয়ে নিজের জেলায় প্রতি ব্লক থেকে কর্মী নিয়ে ব্লক প্রশিক্ষক তৈরি করবে— এটাই দায়িত্ব ছিল। তারা আবার ব্লকে গিয়ে ইউনিট প্রশিক্ষক তৈরি করে পঞ্চায়েত স্তরে 'স্টাডি সার্কেল' তৈরি করবে। সেখানে তৃণমূল স্তরে যে বিষয়গুলো মানুষকে ভাবাচ্ছে, সেগুলোর ওপর আলোচনা করে যে উত্তরগুলো দিতে পারছে না, সেগুলো প্রেসক্রাইবড্ প্রোফরমা-তে উল্লেখ করে ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিকাল ট্রেনিং-কে উত্তরের জন্য পাঠাবে। এই দপ্তরটা আমি দেখতাম, এবং সরাসরি কংগ্রেস সভাপতির কাছে দায়বদ্ধ ছিলাম।

রাজীবজী যখনই ট্রেনিং নিয়ে আলোচনা করতেন তখন ডি পি-র প্রোগ্রাম বলেই উল্লেখ করতেন। একদিন আমি বললাম, এমনিতেই তো সবাই বলে আমি নিজের লোক তৈরি করছি, তারপর আপনিও যদি এভাবেই সম্বোধন করেন, তাহলে তো অভিযোগটাই প্রতিষ্ঠা পায়। উনি বললেন, তাহলে কী বলব? আমি ডিপার্টমেন্টের নামটা বললাম। উনি বললেন, আমি তো ঠিকই বলছি, ওটাও তো ছোট করে বললে, ডি পি-ই হয়।

বলা হয় প্লেন যদি টেক অফ স্টেজে দুর্ঘটনায় পড়ে তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। আমার জীবনেও তাই হল। সবচেয়ে বড় রাজ্য ইউ পি-র তখন সব জেলার ব্লকের প্রশিক্ষণ শেষে রাজ্যস্তরের সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮৭— তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছে। অক্টোবরের প্রথমদিকে সেবার দুর্গা পুজো ছিল। হিমাচল থেকে সতপ্রকাশ ঠাকুর (পরে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী হয়েছিল) বারবার বলছে এবার দশেরায় কুলুতে আসতেই হবে। আমি সেখানে যাব ৭ তারিখ। ৬ তারিখ রাত ১টার সময় জর্জ ফোন করে বলল, লাইনে থাকো, রাজীবজী কথা বলবে। ফোন এল। নির্দেশ পেলাম, ইনকগনিটো নাগপুর যেতে হবে, কারণ প্রভা রাও আর বসন্ত শাঠের ভেতর একটি 'এমএলসি' সিট নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে। দু'জন প্রার্থীই ওয়ার্ধার। লোকালি খোঁজখবর নিয়ে জানতে হবে কে বেশি উপযুক্ত। চুপচাপ কাজ সারতে হবে, তাই এয়ার টিকিটও এআইসিসি থেকে নিলাম না, নিজেই কাটলাম, থাকার জন্য কোনও বুকিং করলাম না। বিকেলের ফ্লাইটে নাগপুর রওনা হয়ে গেলাম। প্লেনে নির্মলা দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা। ওনাকে বিষয়টি খুলে বলাতে উনি বললেন, এর জন্য না গেলেও হত, কারণ সবাই জানে কে বেশি যোগ্য! উনি নামও বলেছিলেন, কার পাওয়া উচিৎ। আর বললেন, তুমি যখন যাচ্ছো, তাহলে রাতেই পাওনার আশ্রমে চলে যাও। আমার বোন (প্রভা) ওখানে আছে। ও তোমাকে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে। দিনের বেলা ওয়ার্ধাতেই এই ৫/৬ জনের সঙ্গে কথা বলে নিও। তোমার কাজ হয়ে যাবে। একটা নামের তালিকাও ধরিয়ে দিলেন।

নাগপুরে নেমে উনি একজন এমএলসি (উনি নির্মলাজীকে নিতে এসেছিলেন)-কে ডেকে বলেছিলেন, ওকে একটা ভাড়ার গাড়ি ঠিক করে দাও, ও পাওনার যাবে। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একজন গাড়ির ড্রাইভারকে ডেকে ভদ্রলোক বলে দিলেন, ও আপনাকে নিয়ে যাবে। সে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে বলল, আগে শহরে চলুন। খেয়ে নিন। তারপর রওনা দেব। আমিও সম্মত হলাম। একটা রেস্টুরেন্টে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি খেতে খেতে আমি একটু ঘুরে আসছি। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে দেখলাম, একটি অন্য ছেলে এগিয়ে এল। আপনি ওয়ার্ধা যাবেন তো? বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো আমায় আনোনি, যে আনল

শীলাজী (দীক্ষিত) আমায় খুব পছন্দ করতেন। তখন সংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। ওনাকে গিয়ে বললাম, আপনি একটা উপায় বাতলান। ওনার ব্যক্তিগত সচিব ছিল হরদীপক সিং, আই এ এস। শীলাজী ওনাকে আমার সঙ্গে জুড়ে দিলেন।

সে কোথায়? ছেলেটি বলল, ও যেতে পারবে না। আমায় আপনার ট্রিপটা করে দিতে বলেছে। ভাড়ার গাড়িতেই তো যেতে হবে। তা সে রাম চালাক আর শ্যাম চালাক। আমি উঠে বসলাম। গাড়িটা হাইওয়ে ধরল। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখছি, দু'টি আসনের মাঝে আমি পড়ে আছি। পেছনের সিটটা উপড়ে পড়েছে। আর চালকের আসন ফাঁকা। কিছু লোক গাড়িটাকে ঘিরে জটলা করছে। আমি শুধু বললাম, আমি একজন এমপি, আমাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে চলো। এক অটোওয়ালা পিছনের সিটে আমাকে বসিয়ে নাগপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এল। আউটডোরে বসিয়ে রাখা হল। সারা শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। আর আউটডোরের আরএমও বলছে, 'কুছ নেহি হুয়া। মলমপট্টি করকে ছোড় দেতে হ্যায়।' আমি মরিয়া হয়ে বললাম, একটু লোকাল এমপি বনওয়ারীলাল পুরোহিতকে ফোন করুন (এখন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল), ও আমার বন্ধু। আমার বাড়িতে খবর দেবে। পুরোহিত আসবার পর সবাই জানল আমি কে! কেবিলে শিফট্ করা হল। ডাক্তাররা দেখে বলল, এক্সরে না করলে কিছু বলা যাচ্ছে না। সকালে এক্সরে করা হবে। বিকেলে প্লেট দেখে ডাক্তাররা বললেন, আপনার কপাল ভাল। কোনও বোন ইনজুরি নেই। কিন্তু আমি টোটালি ইমমোবাইল হয়ে গিয়েছি। পাঁচ দিনের মাথায় আমাকে দিল্লিতে উড়িয়ে এনে আর এম এল হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সব মিলিয়ে পাঁচ সপ্তাহ থাকলাম, ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে শুরু করলাম, সবাই বলল, কপাল ভাল, কোনও ফ্র্যাকচার কোথাও নেই। ছেড়েও দিল। পার্লামেন্টে যাচ্ছি। আমার তখন কোনও গাড়ি ছিল না। অটোতেই বসছি। কিন্তু ডান হাতের তিনটে আঙুল অবশ হয়ে আছে। আমার বাড়িতে ডা. বাগচী প্রায়ই আসতেন। এক সময় জলপাইগুড়ি ছিলেন। '৬৮-র বন্যায় ওনার স্ত্রী গীতা বাগচী বাংলাদেশে ভেসে গিয়েছিল বলে কিছুদিন খুব গুজব ছিল।

উনি ডান হাতটা একদিন দেখে বললেন, আপনার হাতের আঙুল অবশ। আপনার নিশ্চয়ই ভার্টিব্রায় চোট আছে। আপনি আবার প্লেট করান। আর এম এল-এর ডা. কোচার তখন বাইরে থেকে ফিরে এসেছেন। অর্থোপেডিক সার্জেন। উনি নতুন করে প্লেট করালেন। সি-৭-এ কমপ্রেসড ফ্র্যাকচার পাওয়া গেল। উনি বললেন, তোমাকে দেখে আজ আমার বিশ্বাস হল যে, 'মারনে ওয়ালে সে, বচানে ওয়ালে কে হাত লম্বা হোতা হ্যায়।' এই ইনজুরি নিয়ে তুমি পাঁচ সপ্তাহ চলাফেরা করছো কী করে? অবশ্য এটাও বললেন, যখন ধরা পড়েছে চোট কোথায়, তখন আমরা সামলে নেব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

চিকিৎসার ভাষায় যাকে ফোরপোস্ট বলা হয়, আমাকে তাই পরানো হল। বুক থেকে থুতনি পর্যন্ত দু'পাশে বর্ম পরার মতো। এবং ২৪ ঘণ্টা বাঁধা থাকবে। রাতে তার একটা ছোট সংস্করণ দেওয়া হল, সেটা পরতে হবে, আর মাথার দু'পাশে বালিশ চাপা দিয়ে থাকতে হবে, যাতে ঘুমের ভেতর মাথা না নাড়তে পারি। ছ'সপ্তাহ পর এক্সরে হল, হাড় জোড়েনি। খুব মুষড়ে পড়লাম। সে সময় একদিন সুপ্রিয় বলে আমার এক ভক্ত ডা. এস পি মণ্ডলকে নিয়ে এল। উনি খুবই নামকরা অর্থোপেডিকের লোক। আমার দায়িত্ব উনি নিয়ে নিলেন। চিকিৎসা করার কিছু ছিল না, অপেক্ষা করা ছাড়া। তাই ওনার সান্নিধ্যটাই অনেক রিলিফ ছিল। কিন্তু তার পরের ছ'সপ্তাহ পরেও কোনও প্রোগ্রেস নেই। তখন একদমই ভেঙে পড়লাম। আমার কাছে এস পি জয়শোয়াল আসত কলকাতা থেকে। ও বলল, 'ডি পি সাব, আপ কামদেবপুর চলিয়ে। পীরবাবা সে আপকো ইলাজ করায়েঙ্গে। জরুর ঠিক হো জায়েগা।' আমিও বুঝতে পারছিলাম, অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। আর কোনও ওষুধে হাড় জোড়া লাগবে না। তাই একবার এস পি-র কথাই শুনি।

কলকাতায় এলাম। তখন এমপি। তাই নিজাম প্যালেসে ৩ নম্বর ঘরটাতে এসে উঠলাম। নির্ধারিত দিনে বারাসতে কামদেবপুর যাওয়া হল। ওষুধ দিলেন, কিন্তু অনেক বিধিনিষেধ। ওষুধ মানে একটা গাছের পাতার রস বেটে লাগানো হল, আর তা' ঠিক তা'র সাত দিন পর সেটা খুলে নেওয়া হবে। সাত দিন নিরামিষ আহার এবং যে রান্না করবে তাকেও শুদ্ধ বস্ত্রে রান্না করতে হবে। কলকাতায় তখন শঙ্কর (ছোট ভাই) থাকে। ও-ই দায়িত্ব নিল— এসব নিয়মকানুন মেনে আমাকে সামলানোর। সাত দিন পর মাইতিবাবার (পীরবাবা) ছেলে সূর্য মাইতি এসে পট্টিটা খুলে দিল। বিকেলে এক্সরে করে দেখা গেল হাড় জুড়েছে। আমারও ধড়ে প্রাণ এল। সে দফায় প্রায় মাসখানেক নিজাম প্যালেসে ছিলাম। স্বীকার করব, মদন (মিত্র) ওর একটি ছেলেকে (বসন্ত) আমার ২৪ ঘণ্টার ডিউটিতে দিয়ে রেখেছিল, এবং মাঝে মাঝেই মদনের বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে আসত।

যুব কংগ্রেসের প্রোগ্রামটা আমার পর সুরেশ পাচৌরি কিছুদিন চালিয়েছিল। কিন্তু আমি প্রায় দশ মাস ইমমোবাইল হয়ে যাওয়াতে ট্রেনার্স ট্রেনিং প্রোগ্রামটার তখনই অপমৃত্যু ঘটল।

রাজীবজী আমায় আর এম এল-এ যখন দেখতে এসেছিলেন, তখনও ফ্র্যাকচারটা ধরা পড়েনি, ফলে আমার প্রকৃত সমস্যাটা কী সেটা জেনেছিলেন অনেক পরে। যখন বুঝলেন, আমার দ্বারা ছোটাছুটির কাজ সম্ভব নয়, আমাকে কিছু অ্যাকাডেমিক কাজ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সারা দেশের কাস্ট ডেটা তৈরি করা।

১৯৩১-এর সেন্সাসের পর আর কোনও জনগণনায় তখন অবধি জাত জানতে চাওয়া হয়নি, তাই যখন এক একটা সমাজ দাবী করত আমরা এত শতাংশ তবুও আমরা আসন বণ্টনের সময় বঞ্চিত হই। উনি চাইছিলেন এর একটা সদুত্তর দিতে পারার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ডেটা দরকার। আমাকে বলা হল, তুমি এটা তৈরি করো, কোন রাজ্যে জাঠ কত, যাদব কত, ঠাকুর কত, ভূমিহর কত— আমি জানতাম ওনার সামনে কোনও কাজে না বলা যাবে না। তাই রাজি হয়ে গেলাম। হ্যাঁ তো বললাম, কিন্তু করব কীভাবে? আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই জানি না।

শীলাজী (দীক্ষিত) আমায় খুব পছন্দ করতেন। তখন সংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। ওনাকে গিয়ে বললাম, আপনি একটা উপায় বাতলান। ওনার ব্যক্তিগত সচিব ছিল হরদীপক সিং, আই এ এস। শীলাজী ওনাকে আমার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। উনি সব শুনে বললেন, কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। আমি আপনাকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগব। তবু আমি জানতে চাইলাম, মেকানিজমটা কী হবে? উনি বললেন, '৩১-এর সেন্সাস রিপোর্টটা বের করব। তারপর সব জাতির রাজ্যভিত্তিক কনসেনট্রেশন দেখে ওগুলোকে এক্সট্রাপোলেট করে আজকের চিত্রটা বের করব। আমি বললাম, একটু ব্যাখ্যা করুন। —মনে করুন, '৩১ সালে ইউ পি-তে ব্রাহ্মণ ছিল ১১ শতাংশ। '২১ সালে ছিল ১০ শতাংশ। তার মানে দশ বছরে ১ শতাংশ বেড়েছে। সেটাকে মাথায় রেখে আজ কত বাড়তে পারে বের করে নেব, নিখুঁত হবে না, কাছাকাছি তো হবে!

(ক্রমশ)

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Contact 9830410808

জঙ্গলে প্রথমবার

কলেজের সেকেন্ড ইয়ার। সামনে তখন প্রথম অনার্স পরীক্ষার চাপ, কিন্তু তার আগেই পরিবারে এক অন্তহীন শূন্যতা গ্রাস করল। এমন দিশাহারা পরিস্থিতিতে নতুন করে জীবনটাকে গুছিয়ে নেব বলে ঠিক করলাম, ক'টা দিন প্রকৃতির মাঝে থেকে মনের ভার লাঘব করে আসব। ম্যাগাজিন ঘেঁটে ঠিক করলাম যে ডুয়ার্স যাব। জঙ্গল দেখব। এই প্রথম আমার জঙ্গলের অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। এই জঙ্গল ভ্রমণে কোথায় কোথায় থাকতে পারি— সব তথ্যই পেয়ে গেলাম। নানা জায়গায় পড়লাম যে, জঙ্গল ভ্রমণে খুব রঙিন জামাকাপড় না পরাই ভাল। জন্তুরা নাকি পছন্দ করে না। আমরা ধরে আনার বদলে বেঁধে আনলাম, কিনে নিলাম কমান্ডোদের মতো জঙ্গুলে ডিজাইনের জামা-প্যান্ট... মায়, টুপিটাও ওরকম।

মাদারিহাটে বোটকা গন্ধ

একদম প্রথমে যেখানে গিয়ে উঠলাম, সেটা মাদারিহাটের সরকারি পান্থশালা, জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ। মাদারিহাট হল জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রবেশদ্বার। ট্রেনে করে জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে অটোতে শিলিগুড়ি বাস স্টপ, তারপর বাসে চেপে ক্রমে মফস্সল থেকে দূরে ঘনিয়ে আসা জঙ্গলের পথ ধরে শেষে এই মাদারিহাটে এসে পৌঁছালাম। তখনও জানা ছিল না যে, হাসিমারা স্টেশনে নামলে এত হ্যাপা করতে হত না, মিনিট পঁয়তাল্লিশেই পৌঁছে যেতাম। সে যা হোক, ব্যবস্থা এখানে মন্দ নয়। বিশাল টেবিলে এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন দেখলাম। বারোটার মধ্যেই মধ্যাহ্নভোজনের শেষে ক্যাম্পাসে হাঁটছি, এমন সময় ঘ্যাঁও করে শব্দ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখে পড়ল, ক্যাম্পাসে একটা এনক্লোজার মতো রয়েছে। খাঁচায় বনরক্ষীদের উদ্ধার করা লেপার্ড। তারা দিব্যি ঘুরঘুর করছে, পাশের আরেকটা খাঁচায় হরিণের আড্ডা। ক্যাম্পাসটা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির শেষে বড় ক্লান্ত লাগল, ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

শুয়ে আছি, হঠাৎ কোত্থেকে বোটকা গন্ধ নাকে লাগল। খানিকক্ষণ পরেও যখন গন্ধটা গেল না, তখন বুঝলাম, এ মনের ভুল হতে পারে না। প্রথমে ভাবছিলাম যে কোথাও ইঁদুর-টিঁদুর মরে পড়ে নেই তো? ইঁদুর মরলে আমার বড় ভয় করে— এই বুঝি ওটাকে বিনা ঝক্কিতে গিলবে বলে সাপ এল! কিন্তু পরে বুঝলাম যে গন্ধটা আসছে সিলিং-এর দিক থেকে। সিলিং কাঠের পাটাতনে তৈরি, তবে পাতগুলোর মাঝে ফাঁক চোখে পড়ে। নেমেই গার্ডদের জিজ্ঞেস করতে ওরা বলল যে, মাঝেমধ্যে বাংলোর ছাদ আর ঘরের সিলিং-এর মাঝে যে ফাঁকটা থাকে, সেই অন্ধকারে বাদুড়ে বাসা করে থাকে, তাই এই বোটকা গন্ধ। বোঝো ঠেলা! আমার প্রথম জঙ্গল অভিজ্ঞতায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, তার সব আয়োজনই মজুত দেখছি! সে যাক গে, কালই তো এখান থেকে কেটে পড়ছি, তাই এসব নিয়ে আর ঝামেলা পাকালাম না।

সন্দিগ্ধ লেপার্ড

জঙ্গলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ মজাটা আছে, সেটা চেটেপুটে উপভোগ করতে ইচ্ছে করছিল। বাবা-আমি দু'জনেই একমত যে, প্রথম দিন বলে একেবারে শুয়ে-গড়িয়ে কাটাতে হবে এমন নয়, বরং কাছেপিঠেই কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারি বিকেলটার জন্য। লজের গেটের কাছেই একটা সাফারি জিপ ভাড়া করে ছুটে চললাম সাউথ খয়েরবাড়ি নেচার পার্কের পথে। এর প্ল্যান আগে থেকে ছিল না। বরং এই জায়গার কথা জিপ ড্রাইভারের কাছ থেকেই প্রথম জানলাম। খয়েরবাড়ির মজা হল, কাচবন্ধ গাড়িতে চড়ে লেপার্ড দেখা যায়। ওরা পথেই ছাড়া থাকে, আপন মনে পায়চারি করে।

আগে-পরে পরপর দুটো সাফারি গাড়ি চলল। প্রথমটায় আমরা এবং অন্য এক টুরিস্ট পার্টি, তাদের বাচ্চার হাতে ক্যামেরা। একটু পরেই ঢুকে পড়লাম লেপার্ড করিডরে। ড্রাইভারজি বললেন, ছবি তুলুন যত খুশি, কিন্তু ফ্ল্যাশ দেবেন না। তাহলে কিন্তু হামলা করতে পারে রেগে গিয়ে। সবাই ঘাড় কাত করলাম। একটু এগতেই দেখি লেপার্ডরা আরামসে করিডর দখল করে আছে। কেউ হাঁটে, কেউ বসে থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে টুরিস্টদের দিকে চেয়ে আছে। এরকম সাফারির অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। দারুণ মজা লাগল। বেশ পটাপট ছবি তুলছি, এমন সময় আলোর ঝলকানি, আর অমনি দুম করে কাচের গায়ে থাবার বাড়ি। ক্ষুব্ধ দুই লেপার্ড যেন আমাদের শাসিয়ে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। পিছনে ঘুরে বাচ্চাটার বাবা-মাকে ড্রাইভারজির ধমক— আপনাদের বলেছিলাম না ফ্ল্যাশ না দিতে? সবাই মিলে যদি অ্যাটাক করত তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যেত।

পথ আটকাল দাঁতাল

সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে বুড়িতোর্সা নদী। ওয়াচটাওয়ারে দাঁড়িয়ে সান্ধ্য গোধূলি-মাখা খয়েরবাড়ির মন কেমন করা রূপ দেখে বিভোর হয়ে গেলাম। একটু আগেই লেপার্ড সাফারি সেরে ফেরার পথে এই গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ওয়াচটাওয়ারে উঠেছি। দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে এসেছে, এবার যেতে হবে। ফিরতি পথে যেতে যেতে জিপের ড্রাইভারজি বললেন, এখানে মাঝে মাঝে এক উৎপাত হয় বুঝলেন— দাঁতালে পথ আটকে দেয়। ওঁর কথা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় বৃংহণে কেঁপে উঠল গোটা জঙ্গল। সচকিত হয়ে গেলাম। ড্রাইভারজি বললেন, অ্যায়, কাছেপিঠেই কোথাও রয়েছে ব্যাটা। এখন চটজলদি এই পথ পেরতে পারলে হয়।

খানিক দূর এগিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন ড্রাইভারজি। মুখে কথা নেই। ঠাহর করে দেখলাম, দূর রাস্তায় গাছপালার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছিল, সেখানটা জুড়ে এক সুবিশাল কালো ছায়া। নড়ছে।

রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দাঁতাল হাতি! এক বৃহৎ কালাপাহাড়। আপন মনে ডালপালা ভাঙছে। ড্রাইভারজি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন। আমরা অবাক, আরে, কী করছেন? আমরা কি ফিরব না? গাড়ি না থামিয়েই ড্রাইভারজি মেঠো পথ ধরলেন, গাড়ি চলছে খুব জোরে। বললেন, আপনারা চিন্তা করবেন না। গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এদিক দিয়েও ঘুরপথে ফেরা যায়। তবে সময় লাগবে বেশি। অগত্যা কী আর করা, সময় যতই লাগুক, সোজা পথে তো আর যেতে পারি না। দাঁতালের সঙ্গে টক্কর বোধহয় মাতালেও নেবে না।

হলঙে হাতির পিঠে

এসে গিয়েছি হলং। আগের দিনের জিপে করেই চলে এলাম। হলং জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মধ্যিখানে ঝোরার পাশে গড়ে ওঠা বনবাংলো। বাংলোয় আটটা ঘর। ডাবল বেডের ভাড়া থাকা-খাওয়া আর এলিফ্যান্ট রাইড ধরে প্রায় আঠেরোশো টাকা।

বাংলোর কম্পাউন্ডে দুটো মাদি হাতি মনের আনন্দে শুঁড় দোলাচ্ছে আর পতপত করে কান নাড়ছে। শুনলাম, এরাও নাকি এক অর্থে সরকারি চাকুরে এবং যথাসময়ে এদের রিটায়ারমেন্টও হয়! একটা টাওয়ারে উঠে হাতির পিঠে চেপে বসা গেল— চারজন করে টুরিস্ট আর একজন মাহুত। দুলকি চালে গজগমন শুরু হল। প্রথমে ওরকম টলমলে চলাচল দেখে ভয় হল, এই রে, হাতিও ওলটাবে, আর আমরাও এর নিচে চাপা পড়ব। মাহুতদাদা আশ্বাস দিলেন। হাতি ওরকমভাবেই চলে, তা বলে উলটে যাবে না। হাতি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মূল সাভানা তৃণভূমিতে ঢোকার আগে ঘন বন ভেদ করে চলল। ডালপালাগুলো আমাদের বেজায় খোঁচা দিচ্ছিল। মাহুত হাতির কানের পিছনে পা দিয়ে ঠেলা মারছে, আর ইশারা বুঝে হাতি সেইমতো চলছে। মাহুতদাদা অবশ্য বললেন, রাস্তা এদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। তবে পেটুক তো, গাছটাছ ভাঙতে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন কিছু হল না, হাঁটুসমান গভীর হলং ঝোরাটা হস্তিনী মহারানি জলকাদা পার হওয়ার মতো করে পেরিয়ে সাভানায় উঠলেন। এখানে একশৃঙ্গ গন্ডার দেখার সুযোগ খুবই বেশি। একটু এগিয়েই যা চোখে পড়ল তা কল্পনাও করিনি। দুটো গন্ডারে সাংঘাতিক গুঁতোগুঁতি চলছে। কী নিয়ে কে জানে! এই রেস্‌লিং-এ রেফারি হিসেবে তৃতীয় কোনও গন্ডারের দেখা মিলল না। গন্ডার অবশ্য একাই থাকে। তাই দু'জনে কাছাকাছি এসে পড়ায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট হয়ে থাকবে হয়ত। আশপাশে আরও দু'-চার হাতির উপর গাদাখানেক টুরিস্ট স্নাইপারের মতো হাই জুম ক্যামেরা তাক করে আছে দুই মহাবলীর দিকে। ফিরতি পথে জঙ্গলের মধ্যে হলদে-কালো কী একটা হুস করে চলে গেল। টাইগার! আমি বলে উঠলাম। বাবাও চমকে তাকাল। কিন্তু অন্য হাতির পিঠে বসা এক ফিরিঙ্গি বলল, অও... দ্যাট'স আ ডিয়ার।

বাঘ! বাঘ!

বনবাংলোয় যে এরকম দারুণ ভূরিভোজের বন্দোবস্ত থাকে তা জানা ছিল না। দামি সুসজ্জিত হলে সে একেবারে এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন যাকে বলে। পরিপাটি সব ব্যবস্থা। মোটামুটি সব অতিথিই একসঙ্গে ডিনার শুরু করেছে। তবে খাওয়াটা আমার একটু আগেভাগেই সারা হয়ে গেল। প্রথমে ভাবলাম রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর মনে হল, নাঃ, এখন শুয়ে কী হবে, আগে বাবারও খাওয়া শেষ হোক। বাংলোর সবচেয়ে উঁচু তলায় চলে এলাম। এ জায়গাটা ওয়াচটাওয়ারের মতো। বিশাল বিশাল দুটো সার্চলাইট ফোকাস করা আছে জঙ্গলের দিকে। ঘরের মধ্যে আলোর পোকাগুলো ফরফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বহু দূর পর্যন্ত আলো গিয়েছে। সেদিকেই চেয়ে রইলাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে হাই উঠছিল। এমন সময় মনে হল, বাংলোর কাছে যে ঘাটমতো করা আছে, তার কিছু দূরেই গাছের উপর দুটো চোখ জ্বলছে! নিচেও বোধহয় আরও খান দুয়েক জ্বলছে। হঠাৎ দেখি, জ্বলন্ত চোখ দুটো গাছ থেকে নিচে ঝাঁপ মারল। আমি তখন দারুণ উত্তেজিত। বাঘ! বাঘ! বাঘ দেখা যাচ্ছে... বলতে বলতে নিচের ডাইনিং হলে ছুটলাম। টেবিলে গিয়ে হামলে পড়লাম, বাবা, শিগগির এসো— বাঘ! ও মা, যেই না বলা, বাবার চেয়েও তড়িঘড়ি করে সবাই খাবার ফেলে উপরে ওয়াচটাওয়ারের দিকে ছুটল। বাবাও বাদ গেল না। আমি যখন ওপরে পৌঁছালাম, তখন দেখি অনেকে ভিড়

করে আছে। সকলেরই চোখ জঙ্গলের দিকে, আর মুখে খালি একটাই কথা— কই? কোথায়? আমিও সেই চোখগুলোকে আর দেখতে পেলাম না। তার বদলে চোখে পড়ল, দুটো বাইসন পাশাপাশি জাবর কাটছে। এখানকার গার্ড বলল, ক'দিন আগেও নাকি কম্পাউন্ডের কাছাকাছি বাঘ এসেছিল। তবে এরা সাধারণত চিতা বাঘ বা লেপার্ড, এদের ভাষায় তেন্দুয়া। রয়্যাল বেঙ্গল চোখে পড়ে না। ব্যাঘ্র অন্বেষণে এসে হতাশ অর্ধভুক্ত অতিথিরা আবার ডাইনিং হলে নামতে লাগল।

পিছনে গন্ডার

হলঙে নতুন ভোর। প্রায় পৌনে ছ'টা বাজে। একটা পাতলা স্টোল গায়ে দিয়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়ালাম। হাতে নতুন কেনা বাইনোকুলার। বাংলোর পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে হলং ঝোরাটা। সেখানে ঘাটটা শান বাঁধানো। আগের দিন বিকেলে টুরিস্টরা সবাই এখানে বসে। দেখতে পাচ্ছিলাম, দূরে সাভানায় সল্টলিক রাখা। সেখানে নুন চাটতে আসছে হাতি-গন্ডার। কিন্তু আজ সকালে তাদের আর দেখা পেলাম না।

বাইনোকুলারে জংলা আর গাছগাছালি বাদে কিছুই চোখে আসছে না। এমন সময় গার্ডের গলার আওয়াজ পেলাম, গেন্ডা ঢুন্ড রহে হ্যায় সাহাব? জরা পিছে দেখিয়ে। ও মা! পিছনে তাকিয়ে দেখি, একটা প্রমাণ মাপের গন্ডার বাংলোর পাশের ঘাসপাতা খাচ্ছে। বোঝো! আমি দেখছি জঙ্গলের দিকে, আর এদিকে ইনি কখন যে ঝোরাটা পেরিয়ে এদিকে উঠে এসেছেন তা খেয়ালই করিনি। এগিয়ে এসে গন্ডারের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম, ভ্রুক্ষেপও করল না। তবে ওর খড়্গে হাত বোলানোর মতো অত সাহস হয়নি।

টিয়াবনে টিয়ার খাঁচা

পাপাই আর জটলাদা আমাদের যখন নিতে এল, তখন সকাল সাড়ে এগারো। না, আত্মীয়টাত্মিয় কেউ নয়। টুকাকাকা যখন ডুয়ার্স বেড়াতে এসেছিল, তখন পাপাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। টুকাকাকাই এদের নম্বর দিয়েছিল। পাপাইদের অনেক বিজনেস, ট্রাভেল থেকে হোটেল— মায়, লাটাগুড়িতে ওদের একটা দশকর্মার দোকানও আছে। পাপাই প্রায় আমার বয়সি। ড্রাইভার জটলাদার বয়স আন্দাজ করা কঠিন, পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। যা-ই হোক, হলঙে একরাত কাটিয়ে আমাদের ঠিক করা ছিল যে, মূর্তি নদীর ধারে কাটাব। তা ছাড়া ওখান থেকে গোরুমারাটাও কাছে পড়ে। যেতে যেতে পাপাইয়ের সঙ্গে নানান গল্প হল। আমাদের গন্তব্য ছিল মূর্তি নদীর কাছাকাছি টিয়াবন রিসর্ট। ভ্রমণ ম্যাগাজিনেই এর উল্লেখ পেয়েছিলাম। বুকিংও সেইমতো

সারা ছিল, পাঁচশো টাকা প্রতিরাত। তবে বুকিং কেবল একরাতের জন্যই করেছিলাম।

রিসর্ট ক্যাম্পাসে পৌঁছালাম সাড়ে বারোটা নাগাদ। আমাদের নামিয়ে দিয়ে পাপাইরা চলে গেল। কটেজগুলো বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি। ক্যাম্পাসে রিসর্টের কর্মচারীরা বললেন, আপনারা বেলা করে এসেছেন, লাঞ্চ সেরে নিন ডাইনিং হলে। ততক্ষণে আপনাদের ঘর রেডি হয় যাবে। ভাবলাম, ভালই হল, খিদেও পেয়েছিল খুব। লাঞ্চের আয়োজন দেখলাম মোটামুটি। জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ বা বিশেষ করে হলঙের ধারেকাছে আসবে না। তাতে কী, খরচাও তো কম। তবে খরচ কম বলে এমন দৃশ্য দেখতে হবে, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। খেয়ে এসে কটেজে উঠতে যাব, একটু রেস্ট নেব— কিন্তু এ কী! কটেজ রেডি হওয়া বলতে ভেবেছিলাম রুম সার্ভিস চলছে, এরা যে কথাটা লিটারালি মিন করছে— ভাবিনি। কটেজের বাথরুমের জন্য বাঁশের কঞ্চি বসাচ্ছে তখন এরা! মানে এরপর কমোড ও নানান ফিটিংস বসবে! শুধু তা-ই নয়, শোবার ঘরেও বাঁশের কঞ্চিগুলো হাঁ করে আছে। আমরাও হাঁ। এটা কি টিয়াবন রিসর্ট নাকি টিয়াবনে টিয়ার খাঁচা! লেবাররা বলল, আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না, আধ ঘণ্টার মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে। আবার সেই রেডির গল্প। বাবা খেঁকিয়ে উঠল, ইয়ারকি মারার জায়গা পাননি আপনারা! রিসেপশনিস্টের তখন কাঁচুমাচু অবস্থা। বাবা তো কিছুতেই ছাড়ে না। নানা ধমকটমকের পর শাসিয়ে বলল, আমরা অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। কলকাতা ফিরি, তারপর আপনাদের ব্যবস্থা হচ্ছে। পাপাইকে ফোন করাতে ও অন্য এক জায়গায় বন্দোবস্ত করে দিল। ভয় খেয়েই হোক বা অন্য কারণে, কলকাতা ফিরে বাবা দেখে, অ্যাকাউন্টে পাঁচশো টাকা ক্রেডিট হয়ে গিয়েছে।

মূর্তিতে ফুর্তি

কোনও দেবতার থান আছে কি না জানা হয়নি। তবে মূর্তি হল এখানকার পাহাড়ি নদী। নদীর এপাশে অপ্রশস্ত ঘাসে ঢাকা মাঠ আর ওপারে বনজঙ্গল। নদী বরাবর তাকালে দূরে ওই ভুটানের নীল পাহাড়ের সারি হাতছানি দেয়। মূর্তি নদীর উপরে সিমেন্টের ব্রিজ। এই রাস্তার যোগ আছে গোরুমারা, চালসা, লাটাগুড়ির সঙ্গে। শুনলাম, বর্ষাকালে নাকি ভরা নদীতে স্থানীয় কচিকাঁচারা লাফ মারে ব্রিজের উপর থেকে! এখন অবশ্য পুজোর সময়— হাঁটুজল। খরস্রোতা নদীর তলে ছোট বোল্ডারগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হঠাৎ আমার নদী পেরবার শখ জেগে উঠল। জলের স্রোত খুবই বেশি।

এবড়োখেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে কোনওরকমে হাত দু'দিকে নিয়ে ব্যালেন্স করে বহু কষ্টে ওপারে পৌঁছালাম। সেখানেও এক টুরিস্ট ফ্যামিলি চান করছে। একটু দূরে জলে নেমে জাল ছুড়ে দিচ্ছে একাকী জেলে।

ফেরার সময় বুঝতে পারলাম, জল বেড়েছে, আন্দাজে কোমর ছুঁয়ে যাবে। একবার ভাবলাম, ঝুঁকি না নিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে চলে গেলে ভাল হয়। ওপার থেকে বাবাও হাঁক পাড়ছে। কিন্তু মাথায় বেয়াড়া ভূত চেপেছে— নদী পেরিয়েই ফিরব। স্বপ্ন আধা পূরণ করে কোনও মজা নেই। তাই আর যা-ই হোক না কেন, এ পথেই ফিরছি। ব্যালেন্স করার জন্য জঙ্গল থেকে একটা গাছের সরু ডাল কুড়িয়ে নিলাম। টুরিস্ট ফ্যামিলির ছেলেটা আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট হবে। সে-ও দেখি দাদা দাদা করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্যাটার নদী পেরনোর শখ জেগেছে। ওকেও একটা ডাল কুড়িয়ে আনতে বললাম। নদী পারাপারের সঙ্গী জুটে ভালই লাগল।

গোড়ালি ডুবল... আসতে আসতে হাঁটুও। শরীর যত জলের তলায় যাচ্ছে, আমার সঙ্গীর মনবলও সেভাবেই তলাচ্ছে। বেচারা দেখি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। কী আর করা? ফিরে যেতে বললাম। ওর বাপ-মায়েও ডাকছে ওকে। আঃ, এবার বাকিটা একা একা পেরতে হবে। এতক্ষণ সুন্দর গল্প জমে উঠেছিল।

কোমরটা যখন ডুবে গেল, তখন জলের ধাক্কা সামলানো যায় না। ভাগ্যিস গাছের ডালটা ছিল! সেটায় ভর দিয়ে অতিকষ্টে তীরের কাছাকাছি এসেছি এমন সময় তরি ডুবল— গাছের ডালটা গেল ভেঙে। টাল সামলাতে না পেরে ঝুপ করে ডুবে গেলাম খরস্রোতা জলে। জল এখানে দু'ফুটমতো গভীর। কিন্তু স্রোত এমনই, কিছুতেই ভেসে উঠতে পারছি না। আমার সাঁতার জানাটা এখানে কোনও কাজেই আসছিল না। নিচের বোল্ডারগুলো এতই ছোট যে ওগুলো আঁকড়ে ধরতে গেলে উঠে আসছে। নদী আমাকে জলে ডুবিয়ে ঠেলে বহু দূর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর আমিও প্রাণপণে প্রতিরোধের উপায় খুঁজছি। আন্দাজে প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট ভেসে গিয়েছি জলের তলায়। শ্বাস আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। এমন সময়— কপাল বেশ ভালই বলতে হবে, যে বোল্ডারটা আঁকড়াতে পারলাম, সেটা বেশ বড় আর ভারী। তার জোরেই কোনওরকমে জলের তলা থেকে উঠে দাঁড়ালাম প্রায় মিনিটখানেক বাদে! জীবনে ওই প্রথম মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। পাড়ে উঠে বুঝতে পারলাম, প্রাণের মায়া কী জিনিস! একটা সুপার থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল আর কী! তবে এসবের চোটে মচকে যাওয়া ডান হাতটা ভোগাল আরও দেড় বছর।

এইভাবে ভালমন্দ নানান অভিজ্ঞতায় কেটে গিয়েছিল ডুয়ার্সের ক'টা দিন। এখানেই যে এই ট্রিপের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তা নয়, গোরুমারায় গোরু ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হওয়ার পর জটলাদার গাড়িতে করে ঝালং-বিন্দু-ফুন্টশেলিং আর টুকাকাকার শিলিগুড়ির বন্ধু রথীনদার গাড়িতে লোলেগাঁও ট্রিপ— সবই হয়েছিল। তবে এই ডুয়ার্স ট্রিপে সমতলের এই নদী-ঝোরা-বনজঙ্গল একেবারে মন জুড়ে বসল। সেই ভালবাসার থেকেই হয়ত চার বছর বাদে আবার সেই জলদাপাড়াতেই উপস্থিত হয়েছিলাম, তবে এবার বন্ধুদের নিয়ে, আর টুর গাইড হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিলাম আমার প্রথম জঙ্গলে আসার অভিজ্ঞতাকে।

সুপ্রতিম ঘটক

ছবি: ভাস্কর কুমার দাস

উৎসবের খানা খাজানা

বাঙালি মানেই উৎসব আর উৎসব মানেই ভুরিভোজ। সারা বছর যা-ই হোক না কেন, উৎসবের ক'দিন আমরা একটু অন্যরকম খেতেই পছন্দ করি। না, এই সময় কোনও ডায়েট চার্ট মানা যাবে না। সুগার-প্রেশার যা-ই থাক, নিয়ম মানব না। আজ আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্ন্যাক্স, ডিনার— অর্থাৎ গোটা একটা দিনের খাবারের চারটে রেসিপি দিলাম। পছন্দ হলে যে কোনও একদিন পরিবারের সকলকে রেঁধে খাওয়ান। যাকে খাওয়াবেন, সে-ও খুশি হবে আর আপনিও তৃপ্তির হাসি হাসবেন।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

ব্রেকফাস্টে ডিমের পরোটা, সঙ্গে ধনেপাতার চাটনি

উপকরণ: (চারজনের জন্য) আটা ২ কাপ, ময়দা ২ কাপ, ডিম ৪টি, বড় পেঁয়াজ কুচি ১টি, লংকা কুচি আন্দাজমতো, ধনেপাতা আন্দাজমতো, লংকা গুঁড়ো সামান্য, সাদা তেল ১ কাপ, চিনি ও নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: সমপরিমাণ আটা-ময়দাতে নুন, চিনি ও ৫/৬ চা চামচ সাদা তেল দিয়ে, খুব ভাল করে ঠেসে মেখে, ময়ান দিয়ে হালকা গরম জল দিয়ে ডো-টা মেখে নিতে হবে। ভাল করে মেখে আধ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিতে হবে। একটি পাত্রে ডিমগুলোকে পেঁয়াজ কুচি, লংকা কুচি, ধনেপাতা কুচি, নুন, লাল লংকা গুঁড়ো দিয়ে খুব ভাল করে ফেটিয়ে রাখতে হবে। এবার ডো-টিকে চার ভাগ করে চারটে গোলা তৈরি করতে হবে এবং রুটি থেকে বড় করে গোলাকারে বেলে নিতে হবে। তাওয়া গ্যাসে কম আঁচে বসাবেন, বেশি আঁচে পরোটা নরম হয় না। এবার তাওয়ায় রুটিটা দিয়ে, খুন্তি দিয়ে একটু হালকা করে দু'পিঠ চেপে চেপে কাঁচা ভাবটা কাটিয়ে দি। রুটির উপর ডিমের গোলা থেকে চার ভাগের এক ভাগ রুটির উপর দিয়ে দিন ও রুটিটাকে চারদিক থেকে ভাঁজ করে খামের মতো করে ফেলুন। তারপর সাদা তেল দিয়ে রুটির উপর ব্রাশ করতে থাকুন। ভালভাবে ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ছুরি দিয়ে আড়াআড়িভাবে কেটে ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

লাঞ্চে অন্যান্য পদের সঙ্গে এটি একটি মাছের পদ— 'তেলে-ঝালে ইলিশ'।

উপকরণ: ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি মাছের জন্য, পেঁয়াজ বাটা ৩ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রশুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচালংকা বাটা আধ চা চামচ (একটু ঝাল না হলে ভাল লাগবে না), জিরে বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধ চা চামচ, ফেটানো টক দই আধ কাপ, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, গোটা জিরে ১ চিমটে ফোড়নের জন্য।

প্রণালী: মাছটাকে দোকান থেকে ছুলে আনুন, কাটাবেন না। বাড়িতে ভাল করে ধুয়ে তারপর টুকরো করুন। আর ধোবেন না, তবেই ইলিশ মাছের স্বাদ পাবেন। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে জিরে ফোড়ন দিন ও একে একে দই বাদে সব মশলা দিয়ে দিন। খুব ভালভাবে মশলা কষে এলে মাছগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন ও দু'পিঠ উলটে দিয়ে, ফেটানো টক দই দিয়ে দিন। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঢাকনা খুলে দিন। মশলা ও দই মাছের সঙ্গে ভালভাবে মাখো মাখো হলে চেরা কাঁচালংকা ও কাঁচা সরষের তেল উপরে ছড়িয়ে দিন। কড়াই ঢেকে রাখুন ও গ্যাস বন্ধ করে দিন। গরম সাদা ভাতে খাবেন, দেখবেন কী অপূর্ব স্বাদ ইলিশের। সন্ধেবেলায় একদম কম চিনি বা চিনি ছাড়া দার্জিলিং চা খান। সঙ্গে একটা হালকা পকোড়া বানিয়ে খান।

মাশরুম পকোড়া

উপকরণ: মাশরুম ২৫০ গ্রাম, রশুন বাটা ৩/৪ চা চামচ, কাঁচালংকা বাটা স্বাদ অনুসারে, নুন, গোটা লেবুর রস ১টা, সাদা তেল ৪ কাপ, ব্যাটারের জন্য সমপরিমাণ ময়দা ও বেসন, নুন, কালোজিরে, লংকা গুঁড়ো ও হলুদ গুঁড়ো অল্প করে।

প্রণালী— মাশরুমগুলোকে প্রথমে জলে নুন দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিন। তারপর জল ঝরিয়ে ঠান্ডা হলে রশুন বাটা, নুন ও লেবুর রস দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন অন্তত ১ ঘণ্টা। এরপর ময়দা, বেসন, কালোজিরে, লংকা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে ওর মধ্যে মাশরুম ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ডিপ ফ্রাই করুন। চায়ের সঙ্গে দারুণ লাগবে।

ডিনারে ফ্রায়েড রাইস, সঙ্গে চিকেন কিমার ভর্তা।

উপকরণ: চিকেন কিমা (২৫০ গ্রাম), বড় পেঁয়াজ কুচি ২টি, আদা কুচি ২ ইঞ্চির মতো, রশুন কুচি বড় চামচের ২ চামচ, বড় টম্যাটো কুচি ১টা, কাঁচালংকা স্বাদ অনুসারে, নুন স্বাদ অনুসারে, সরষের তেল ১০০ গ্রাম, কসুরি মেথি ২ চা চামচ, ফোড়ন দেবার শুকনো লংকা, তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা আন্দাজমতো, গুঁড়ো গরম মশলা আধ চা চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ১ কাপ।

প্রণালী: সরষের তেল গরম হয়ে গেলে শুকনো লংকা, তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে একে একে পেঁয়াজ, আদা, রশুন কড়াইতে দিয়ে ভাল করে ভাজতে থাকুন। বাদামি হয়ে এলে চিকেন কিমা দিয়ে দিন ও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে টম্যাটো কুচি ও কাঁচালংকা কুচি দিয়ে দিন। ভাল করে কষাতে থাকুন। কষানো থেকে তেল বার হলে তার মধ্যে কসুরি মেথি দিয়ে ভাল করে নেড়ে, গ্যাস বন্ধ করে কড়াই চাপা দিয়ে ঢেকে রাখুন। ফ্রেশ ক্রিম উপরে ছড়িয়ে দিন। ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে সাইড ডিশ হিসেবে এই পদটি খেয়ে দেখুন, রাতের খাবার দারুণ উপভোগ করবেন।

শালবনে রক্তের দাগ

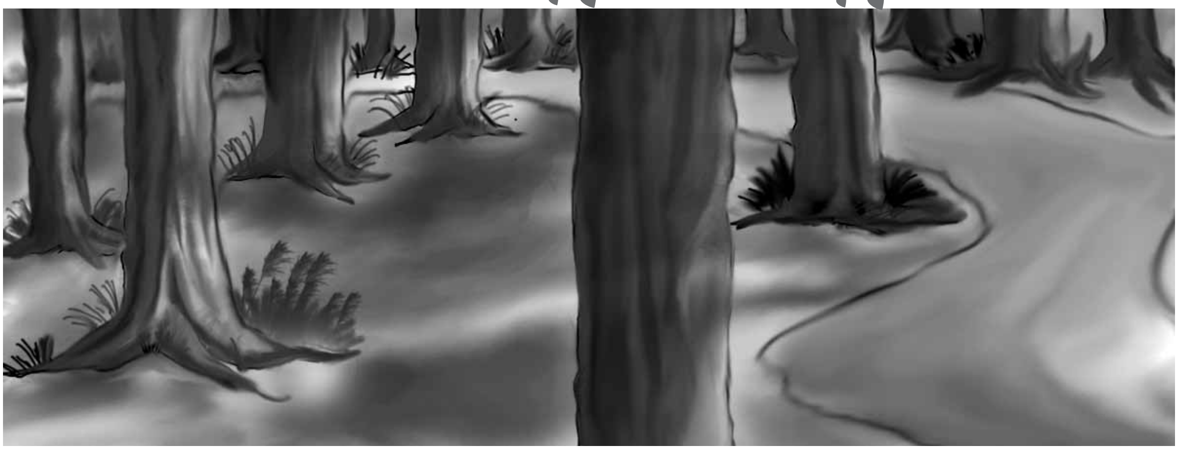

পৃথিবীর এক অনাবিষ্কৃত অঞ্চল ডুয়ার্স একলা মনে ঘুমিয়ে ছিল জলজ আবহাওয়ায় প্রাণের গভীরে তার সন্তানদের নিয়ে। সেখানে পা রেখে মানুষ সেই মায়ের সন্তানদের নির্বিচারে হত্যা, পাচার, তথা নানাবিধ অত্যাচারের উৎসবে মেতে উঠল। ডুয়ার্সের প্রাণী, উদ্ভিদ... লোভের ফসল হয়ে উঠল ভদ্রবেশী মানুষের লোলুপতার কাছে। প্রকৃতি কি প্রতিশোধ নেয়? এখান ডুয়ার্স পত্রিকায় এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে **সাগরিকা রায়**-এর থ্রিলার— শালবনে রক্তের দাগ।

(১)

ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট আগে। ডিনারের আগে অভ্যেসমতো হুইস্কি নিয়ে বসেছি। দুটো সিপ দিতে না দিতেই ডোর বেল বেজে উঠেছে। অবাক হওয়ার মতোই অবস্থা আমার, 'এখন আবার কে এল' ভেবে। এ সময় সাধারণত কেউ আসে না। সন্ধের দিকে কখনও আমার ড্রাইভার শ্যামল আসে। তো শ্যামল এখন মুম্বইতে। এল কে? আমার পার্মানেন্ট ঝি-চাকর কেউ নেই। একা মানুষ। বেড়াতে চলে যাই ইহাঁ-উহাঁ। সুতরাং রান্না আর বাকি কাজকর্ম করে দিয়ে যায় যে মহিলাটি, সে সকালে আসে। এখন যে-ই আসুক, দরজা আমাকেই খুলে দিতে হবে। অগত্যা উঠে গিয়ে দরজা খুলেছি। আর খুলেই চমকে উঠেছি। দরজার বাইরে সোনা রঙের সিল্কের শাড়ির জরির আঁচল মাটি ছুঁইছুঁই, বার্গান্ডি কালারের খোলা চুল, হাতে-গলায় নেকলেস, গোছা চুড়ি... একটি সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে। ফ্যাকাশে হেসে জিজ্ঞাসা করল, ফিনাইল নেবেন? আরও কিছু আছে আমার কাছে। নেবেন? ডিটারজেন্ট, সোপ, কেক... চানাচুর, মেয়েদের ইনার...!

বাবা! এমন রাতের বেলায় এতসব কিনব কি না জানতে? ওর হাতের ব্যাগে সব মাল আছে? তরুণীর মুখের ভাব কেমন ফ্যাকাশে যেন! আমার একতলা বাড়ির লনের নরম আলোয় মহিলাকে ভীত দেখাচ্ছে। এই মহিলা ফেরিওয়ালা? স্বপ্ন দেখছি নাকি? এ তো সাক্ষাৎ রতিদেবী! কী ফিগার! আমার নেশা হয়ে গিয়েছে নাকি এক পেগেই? সাক্ষাৎ উর্বশী সামনে দাঁড়িয়ে যৌবনের পসরা নিয়ে? এ কী রে বাবা? উর্বশী এত রাতে ফিনাইল বেচতে এসেছে! গন্ডগোল আছে! সামথিং রং! ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছি। মাথা নেড়ে ভাগিয়ে দিচ্ছি, মেয়েটি ঝট করে পিছন ফিরে কী দেখে নিল। তারপর নিজের লাল লিপস্টিক রাঙা ঠোঁটে আঙুল দিল। চুপ!

—মানে? ভড়কে গেলাম। কী ব্যাপার? একা থাকি। আমার সুস্থ জীবনে এসব কেমন ধারার ঝামেলা এল? চুপ বলছে কেন? আজকাল যা সব কাণ্ড হচ্ছে চারধারে! এই সুন্দরী কেন এল! তবে সুন্দরীদের আমি পছন্দই করি। বন্ধুমহলে এ নিয়ে একটু ফিসফাস, চোখ টেপাটেপি আছে। ওসবে কান দিতে নেই! ভাল জিনিস পড়ে থাকবে, আর তাকিয়ে দেখে যাব এমন

মানুষ আমি নই!

—একটু লুকাতে দিন। আমার পিছনে কেউ আসছে। মেয়েটির গলা কেঁপে উঠল। আমি সেল্‌সগার্ল নই। মিথ্যে বলেছি আপনাকে। আমাকে ধরে ফেলতে আসছে ওরা!

—আসছে মানে? কারা? কেন? কোথায়? একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠি। গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করি কাউকে দেখা যায় কি না। রাস্তা যেটুকু দেখা যাচ্ছে, শুনসান। কেউ নেই কোথাও! তাহলে? ইনি এলেন কোথা থেকে? নিজে থেকে এলে অবশ্য বলার কিছু নেই। মেঘ করেছে। চমকি ঝমকি বরষনের আভাস আছে। রাত মন্দ কাটবে না উর্বশীর পরশে!

—ওরা আমাকে বেচে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় গলির ভিতরে গাড়ি থামিয়েছিল কিছু কিনবে বলে। আমি পালিয়েছি।

—ওরা কারা? কোথায় আছে এখন?

—মেইন রোডে। খুঁজছে আমাকে। প্লিজ বাঁচান।

—কিন্তু আপনাকে ওরা পেল কোথায়? মানে আমি আপনাকে চিনি না। বিশ্বাস করি কী করে? আপনি কে? কোথায় থাকেন? এখানে এলেনই বা কোথা থেকে! এটা মেইন রোডের মধ্যে পড়ে না। বেশ নির্জন জায়গা। তো? ঝট করে এদিকে ঢুকে পড়লেন... কেন?

—আগে ঢুকতে দিন। আমি সব বলছি। ওরা এদিকে চলে আসবে এখনই। বেশি দূরে নেই ওরা। প্লিজ প্লিজ। কান্নায় ভেঙে পড়ছে মেয়েটি— একবারের জন্য বিশ্বাস করুন আমাকে।

—কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম। আপনার ব্যাগ, মানে যেটা হাতে ধরে আছেন, ওটাতে পিস্তল নেই, সেটা বলি কী করে? আপনাকে ভিতরে ঢোকাই, আর আপনি দুম ফটাস করে... লুঠপাট চালিয়ে নিশ্চিন্তে পগারপার হয়ে গেলেন। আরে, অভিমানী চোখে তাকাবেন না! এমন হাজারটা হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না। ব্যাগটা দেখাতে হবে। তাড়াতাড়ি করুন। হুম্‌ম, বেশ, বিশ্বাস করছি আপাতত। ব্যাগ একেবারেই নির্দোষ ব্যাগ। আসুন আসুন। আমি থানায় জানাচ্ছি। আপনি লুকিয়ে পড়ুন আগে। হুম, দাঁড়ান, দরজাটা বন্ধ করে দিই। বলে দরজা বন্ধ করে আমি তরুণীকে নিয়ে আমার লাইব্রেরি ঘরে গেলাম। মেয়েটি দ্রুত হাঁটছিল। লুকাতে চাইছিল যত দ্রুত সম্ভব। আমার বাড়িতে একটা লুকানোর মতো জায়গা আছে। কেউ জানে না সেটা। অথচ আমাকে এখন সেই গুপ্ত স্থান প্রকাশ করে দিতে হবে! মেয়েটা বিপদে পড়েছে। আচ্ছা, কীভাবে বিপদটা এল, সেটা এখনও বলেনি কিন্তু। আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওর মুখোমুখি হলাম— হ্যাঁ, এখন বলুন, ওরা কারা?

—জানি না। আমি বান্ধবীর বিয়ের পার্টিতে এসেছিলাম। ডিনার তাড়াতাড়িই করেছিলাম। কারণ একা ফিরে যেতে হবে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে! তবু দেরিই হয়ে গেল! বিয়েবাড়ির কাণ্ড বোঝেনই তো! বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে কেবল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছি ট্যাক্সির জন্য। একটাও ট্যাক্সি নেই। ক্রমেই রাত বাড়ছে। খুব ভয় পেয়েছি, জানেন। রাস্তার লালচে আলোতে সব কিছু কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে! ঠিক তখন একটা ট্যাক্সি পেলাম। হাত তুলতে দাঁড়াল। উঠে বসে শান্তি পেলাম। স্বস্তির শ্বাস ফেলতে না ফেলতেই, দু'চাকা ঘুরতে না ঘুরতেই গাড়ি থামিয়ে চারটে ছেলে উঠে বসল গাড়িতে। বলল, একদম শব্দ নয়। যেখানে নিয়ে যাব, চুপচাপ চল। আমার

এত রাতে একটি মহিলাকে ঢুকতে দিয়েছি বাড়িতে... ভাল করলাম কি না জানি না। কিন্তু মহিলা অসহায়। আশ্রয় না দিয়েই বা কী করি? তা ছাড়া ওই লোকগুলো যদি এদিকে আসে, আমি একা মেয়েটাকে বাঁচাতে পারব কি না কে জানে? আমার কাছে আর্মস আছে যদিও।

তখন অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা! কেউ নেই যাকে ডাকতে পারি... হেল্প চাইতে পারি! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছি! আমার মানসম্মান শেষ হয়ে যাবে! বডি পড়ে থাকবে কোনও জঙ্গলে! মেয়েটি ফোঁপাতে থাকে।

—না না, কাঁদবেন না! আচ্ছা, আপনার বান্ধবীর বাড়ি কোথায়? ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন। ভয় পাবেন না।

—বাড়ি তো ধূপগুড়ি, গ্রামের দিকে। বিয়েবাড়ি বুক করেছিল ধূপগুড়ি মার্কেটের কাছে। ওর মামাবাড়ি ওখানেই কিনা!

—লোকগুলো আপনাকে ধূপগুড়ি মার্কেটের সামনে থেকেই গাড়িতে তুলে নিল? তারপর? কেউ দেখেনি? রাস্তায় লোকজন ছিল না? ভিখিরি-টিখিরি? যাক গে, তারপর?

—তারপর এই গয়েরকাটা এসে গাড়ি থামিয়ে ড্রিঙ্কস কিনতে গেল দু'জন। দরজা লক হয়নি। এই সুযোগ আমার ছাড়া উচিত নয় বলে মনে হল। ওদের হাতে পড়ে যা হেনস্থা হবে তা হবেই। একবার কি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করব না? আমি ঝাঁ করে দরজা খুলেই দৌড়। উফ্‌ফ! কোন দিকে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, জানি না! ওরা হুটোপাটি করে তেড়ে আসছিল! আমি মেইন রোড থেকে ডান দিকে চলে গেলাম। কেন গেলাম, জানি না। হয়ত ওদের ভড়কে দিতে চেয়েছিলাম। তখন মাথায় কী চলছিল কে জানে! আপনার বাড়িতে আলো দেখতে পেয়ে...!

—আপনার নিজের বাড়ি কোথায়? কে আছেন বাড়িতে?

—আমার দাদু ছাড়া আর কেউ নেই। বাড়ি মাদারিহাটে।

আলমারির পিছনের এক মানুষ সমান শেল্‌ফটা টেনে বাইরের দিকে আনতে একটা দরজামতো হয়ে গেল। ভেতরে খুপরি ঘর। লুকিয়ে থাকার আদর্শ স্থান। মেয়েটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। শেল্‌ফটা ফের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। কে বলবে, ওর পিছনে কেউ আছে! কোনও অসুবিধে নেই। ওখানে বসার জায়গা আছে। মেয়েটি একটু হাঁপ ছেড়ে নিক। বেচারি খুব ভয় পেয়েছে। লোকগুলো এদিকে আসতে পারে মেয়েটির খোঁজে। দেখা যাক। থানা এখান থেকে খানিকটা দূর। একটা ফোন করি? এখন যে দায়িত্বে আছে, সন্দীপ আইচ, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওকে বিষয়টা জানিয়ে রাখি? হুম, সেটাই উচিত হবে। এত রাতে একটি মহিলাকে ঢুকতে দিয়েছি বাড়িতে... ভাল করলাম কি না জানি না। কিন্তু মহিলা অসহায়। আশ্রয় না দিয়েই বা কী করি? তা ছাড়া ওই লোকগুলো যদি এদিকে আসে, আমি একা মেয়েটাকে বাঁচাতে পারব কি না কে জানে? আমার কাছে আর্মস আছে যদিও। তবু ওরা চারজন, আমি একা। লড়াইটা অসম হয়ে যাবে! আমিও কোনও বেআইনি কাজে হাত দেব না। আমার লুকটা এখন খুব পরিষ্কার। সেটায় নোংরা লাগাতে দিলে ঝামেলা শালা আমারই।

আমি ফোন করে সন্দীপকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম। সন্দীপ আসছে বলল। হুইস্কির গেলাস হাতে তুলে নিলাম। সন্দীপ আসুক। ততক্ষণ টোটাল ব্যাপারটা শুরু থেকে ভেবে নিই। মেয়েটার কথা সত্যি হলে অবশ্যই কিডন্যাপাররা ওকে এদিকে খুঁজতে আসবে। যেহেতু এই রাস্তায় গোনাগুনতি বাড়ি, আমার কাছে নিশ্চয় আসবে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বলে খুঁজতে আসবে মেয়েটাকে। আর মেয়েটা মিথ্যে বলে থাকলে... কথা হল, মিথ্যে বলবে কেন? এত রাতে নিঝুম গলির ভিতরে একটা বাড়িতে ঢুকে এই নাটক করার মানে কী? সন্দীপ এল কি? গাড়ির আওয়াজ পেলাম যেন!

(২)

লোকটা একটু হেসে বলল, থানা থেকে

আসছি। আপনি ফোন করেছিলেন। ভিতরে আসতে পারি? ভদ্রমহিলা কোথায়?

—আসুন আসুন। সন্দীপ, মানে অফিসার এলেন না? আসবেন বলেছিলেন। আপনি?

—আমি সেকেন্ড অফিসার অনির্বাণ বসু। আমার সঙ্গে দু'জন আছে। ওরা বাইরেটা দেখছে। মহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আসুন। আমি অপেক্ষা করছিলাম আপনাদের জন্য। মুখে কথা বলছি, মনে অন্য কথা ঘুরছে। সন্দীপ আসবে বলেও এল না কেন? এখন সন্দীপের সঙ্গে যোগাযোগ করি কেমন করে? এই লোকটাকে কেমন যেন লাগছে! সন্দীপ তো বলেনি যে ও আসবে না।

—আসুন সুভদ্রবাবু, এই ফ্যানটা... হুম, এই ফ্যানটাই ভাল হবে, এখানেই কাজটা হোক। নিন, উঠে পড়ুন এই চেয়ারে। ফাঁসটা আমাকেই ঠিক করে দিতে হবে। আপনি কি নিজেই ফাঁসটা দেবেন? আচ্ছা, আমিই দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, চমৎকার ফাঁস লাগানো হল। উঠুন উঠুন, চেয়ারে উঠুন। ব্যাস, এবারে ফাঁসটা গলায় পরে নিন। ওয়াও! ফ্যান্টাস্টিক। চেয়ার সরিয়ে নেওয়ার আগে এখানে সই করুন। মানসিক অবসাদে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই আমার। নিজের নাম সই করুন। কুইক।

—কিন্তু কেন? কেন আমাকে মারবেন আপনি? আমি কী দোষ করেছি? আমার বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ কি আসবে না? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হচ্ছেটা কী আমার সঙ্গে? নাটক নাকি? আমি কী করেছি যে মরতে হচ্ছে? আপনি থানা থেকে এসেছেন বললেন। মিথ্যে বললেন কেন? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! কী করেছি বলুন তো?

—কিচ্ছু করেননি। এমনিই মারব আপনাকে। কাল খবরের কাগজে খবরটা বার হবে। অধ্যাপক সুভদ্র সান্যাল দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বুধবার রাতে উনি পাখার সঙ্গে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। হেসে উঠল অনির্বাণ বসু। মানে যদি ওটাই ওর নাম হয়। কিন্তু মেয়েটাকে খুঁজে না পেয়েই আমাকে মারতে চাইছে? জীবনে এই লোকটাকে চোখে দেখিনি। এর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। তাহলে কেন? কেমন অদ্ভুতভাবে হাসছে। পাগল নাকি? এ কি সিরিয়াল কিলার? মৃত্যু নিয়েই কি খেলা করে ও?

লোকটা টেনে আনল আমাকে চেয়ারের সামনে। শক্ত হাতে ঠেলেঠুলে তুলে দিল আমাকে চেয়ারের উপরে। ঘাড়ের কাছে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে। আমাকে আজ এখন অকারণে মরে যেতে হবে? একটু আগেও আমার জীবনটা কেমন ফুরফুরে ছিল। ওই যে টেবিলের উপরে আমার হুইস্কির গ্লাস। এখনও অনেকটা হুইস্কি রয়ে গিয়েছে গ্লাসে। আমার খাওয়া হয়নি। মরে যাব, কেউ এসে গ্লাসের হুইস্কি ফেলে দেবে। ঢেলে দেবে বেসিনে। আচ্ছা, আমাকে মেরে এই লোকটার কী লাভ? লোকটা কে? ও কি মেয়েটার পিছন পিছন এসেছে? তাহলে মেয়েটার খোঁজ না করে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে কেন? আমি ছাড়া কেউ জানে না মেয়েটা কোথায় আছে। আমিই যদি মরে যাই, মেয়েটার খোঁজ কেউ পাবেই না কখনও! অন্ধকার খুপরিতে অপেক্ষা করে

কিচ্ছু করেননি। এমনিই মারব আপনাকে। কাল খবরের কাগজে খবরটা বার হবে। অধ্যাপক সুভদ্র সান্যাল দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বুধবার রাতে উনি পাখার সঙ্গে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। হেসে উঠল অনির্বাণ বসু।

করে পচে-গলে পড়ে থাকবে ওর কঙ্কাল।

—এই, ওঠো চেয়ারে! লোকটা খেঁকিয়ে উঠল— দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠলাম চেয়ারে। এই চেয়ারটা আমি খুব ভালবাসি। আরামদায়ক চেয়ার। আজ সকালেও কি জানতাম, এই চেয়ারটা আমার মৃত্যুর উপকরণ হবে?

—বাহ্, এবারে সই। সিগনেচার। ঠিকঠাক করে করুন। ভুলভাল করে রহস্য বানাতে যাবেন না। আমি আপনার সই চিনে নেব।

লোকটা সেন্টার টেবিলটা টেনে আমার চেয়ারের পাশে রাখল। রেখে নিজেই উঠে দাঁড়াল সেন্টার টেবিলের উপর। কেন এমনটা করল, সেটা বুঝে ফেললাম। লোকটা ফাঁসটা আমার গলায় পরিয়ে দিল। পরিয়ে কেমন একরকম হেসে এবারে নেমে পড়ল মেঝেতে। আমার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নেবে এখন। আর আমি ঝুলে পড়ব। আমার শরীর ঝুলতে থাকবে। পাক খেতে থাকবে পায়ের নিচে মাটির খোঁজে। জিব বেরিয়ে আসবে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে! মৃত্যু এভাবেই এল তাহলে! এভাবে! চোখ বুজে ফেললাম। একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম যেন! সন্দীপ কি এসেছে?

লোকটা চমকে উঠে এক ধাক্কায় আমার পায়ের নিচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। ওর গলার আওয়াজ পেলাম— আপনার জন্যই উনি অপেক্ষা করছিলেন। বাড়িতে মিনারেল ওয়াটার নেই। উনি আমাকে বললেন, সামনের মোড় থেকে মিনারেল ওয়াটার আনতে যাচ্ছেন। দেরি করছেন কেন, সেটা দেখতে যাচ্ছি। আমি এখনই আসছি।

আমি বুঝতে পারছি, লোকটা পালাল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফাঁস গলায় আটকে বসছে। কথা বলার উপায় নেই। বনবন করে ঘুরে যাচ্ছে আমার শরীরটা। যদি থানা থেকে এসে থাকে, আমাকে না দেখে চলে যাবে হয়ত। ওরা জানতেই পারবে না, আমি এখন মরে যাচ্ছি। ঘুরে যেতে যেতে দেখি, সেন্টার টেবিলটা সরাতে ভুলেছে লোকটা। বা, সময় পায়নি। আমি কোনওভাবে ওটার নাগাল পেতে চেষ্টা করতে লাগলাম। পা দিয়ে ওটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ফাঁসটা গলায় আরও এঁটে বসতে লাগল। বুঝতে পারছি, আর বেশিক্ষণ লড়তে পারব না।

তখনই দরজাটা খুলে গেল— এ কী, ঘর তো খোলা! এভাবে ঘর খোলা রেখে দু'জনে চলে গেল? অথচ ফোনে যা বললেন সুভদ্রবাবু... আরে, এই, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো...! ঝুলিয়ে দিয়ে পালিয়েছে।

বুঝতে পারছি, আমাকে দেখতে পেয়েছে ওরা। জ্ঞান হারালাম বোধহয়। কারা আমাকে ধরে নামাচ্ছে, হালকা অনুভব করলাম।

(৩)

গলায় অল্প ব্যথা আছে। এমনিতে শরীর ঠিকই আছে। সন্দীপ অপেক্ষা করছিল। আমার সঙ্গে ওর অনেক কথা আছে। আমিও অনেক কিছু বলতে চাই।

—ভয়ের স্টেজ পার হয়ে গিয়েছেন। ডাক্তার বলেছেন। আপনি কথা বলতে পারবেন?

—পারব।

—বেশ, আস্তে আস্তে বলুন। স্ট্রেস দেবেন না। প্রথম থেকে বলুন। মেয়েটা এল। সে কোথায়?

—ওহ্, আমি জাস্ট ভুলে গিয়েছি। মেয়েটা এল। কেউ তাড়া করে আসছিল ওর পিছনে! প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে কথা বলে মনে হল, মিথ্যে বলছে না। খুব সুন্দরী। চোখে-মুখে সারল্য ঝকঝক করছে। ওকে

লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করলাম। কিন্তু এই লোকটা থানা থেকে আসছে বলল। আশ্চর্য হলাম একটা কথা ভেবে। লোকটা থানা থেকে আসেনি, তাহলে ও কী করে জানল, মেয়েটি এই বাড়িতে আছে? ও-ই কিডন্যাপার? সেই জন্য জানত, মেয়েটা এখানে আছে?

—আচ্ছা, সন্দীপ চিন্তিত— সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনাকে খুন করতে যাচ্ছিল কেন? ও নারী পাচারকারী হোক বা কামুক, লম্পট... আগে তো মেয়েটাকে খুঁজবে! সেটা না করে একটা আত্মহত্যার দৃশ্য বানাচ্ছিল সত্যি সত্যি! আমরা সময়মতো এসে না পৌঁছালে আপনাকে মরতেই হত! আপনি মনে করে দেখুন, কোনও দিনও কি এই লোকটাকে দেখেছেন? কখনও এর সঙ্গে কোনওরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?

আমি কিছুতেই সেরকম কোনও ঘটনা মনে করতে পারলাম না। সারাজীবন লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়েছি। অধ্যাপনায় ডুবে আছি। স্টুডেন্ট ছাড়া কিছু জানি না। আমাকে মারতে আসবে কে? কেনই বা? অথচ এ কথা সত্যি, লোকটা আমাকে মারতেই চেয়েছিল।

—কী বলব, বুঝতে পারছি না অফিসার! আমার জীবনে কখনওই লোকটার কোনও অস্তিত্ব ছিল না! তাহলে তো লোকটাকে দেখেই চিনে ফেলতাম। আর ও থানা থেকে আসছি বলার পরে আমি ওকে বিশ্বাস করতাম! তখনই আপনাকে যেভাবে হোক জানাতাম আমার বিপদের কথাটা! এইভাবে ঝুলিয়ে দিতে পারত? কী হচ্ছিল বলুন আজ! একা একা থাকি! নিরাপত্তা নেই!

—হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছেন। লোকটা আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল! বোকা বানিয়ে চলে গেল! এবারে ওই মহিলাকে ডাকুন। আমার ধারণা, মেয়েটি হয়ত এসব ঘটনার মধ্যে খানিকটা আলো ফেলতে পারে।

—চলুন, মেয়েটা ওই খুপরিতে বসে জ্ঞান হারাল কি না... খুব ভয় পাচ্ছি...!

লাইব্রেরির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম আমরা। আমি আর সন্দীপ। লুকানো শেল্‌ফটার ডান দিকে হালকা চাপ দিতে শেল্‌ফটা এগিয়ে এল সামনে। আর ভিতরের লুকানো জায়গাটা সামনে চলে এল। আধো অন্ধকারে প্রথমে কিছু দেখা যায় না। একটা আলোর ব্যবস্থা আছে। সুইচ অন করতেই চমকে গেলাম। ওই খুপরিতে কোনও উর্বশী, সুন্দরী তরুণী, রতিদেবী... কিস্‌সু নেই! কিচ্ছু নেই! মানে? মেয়েটা কোথায় গেল? এইখানে ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছি আমিই। কেউ জানে না এই গুপ্ত জায়গার কথা! তাহলে? সন্দীপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে কি পাগল ভাবছে অফিসার? পাগল ভাবাই এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। আমি বোকা অথবা দিশেহারা চোখে ছোট খুপরিতে ঢুকে মেয়েটার এখানে লুকিয়ে থাকার মতো যে কোনও প্রমাণ খুঁজতে থাকি।

সন্দীপ বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। নিজে শেল্‌ফের ভিতরে ঢুকে খুঁটিয়ে দেখল। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। মেয়েটা যদি চলেই গিয়েছে (ধরা যাক, সে এখানে থাকতে স্বস্তি পায়নি।) তাহলে গেল কোন দিক দিয়ে? যেতে হলে মেয়েটাকে আমার সিটিং রুম পেরিয়ে যেতে হবে। তা, ওখানে সেই সিরিয়াল কিলারটা আমাকে মেরে ফেলার দারুণ চক্রান্ত করে প্রায় সফল হয়ে যাচ্ছে যখন, মেয়েটা ওর সামনে দিয়ে পালাচ্ছে? আর লোকটা দেখতেই পেল না? অ্যাবসার্ড!

—হুম, অদ্ভুত তো বটেই। তবে কী জানেন, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এখন যেটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, মনে রাখুন, সবচেয়ে অসম্ভবটাই সত্যি হতে পারে। বেশ, আপনি রেস্ট নিন। কাল একবার থানায় আসুন। আপনাকে দিয়ে মহিলার স্কেচ করিয়ে রাখব। বাড়ির চারপাশটা অবজার্ভ করে গেলাম। কিছু বোঝা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। তবে আমাদের বাড়তি নাক আছে। ঠিক টের পেয়ে যাব। চলে গেল সন্দীপ। যাওয়ার আগে বারবার সাবধান থাকতে বলে গেল। একজন কনস্টেবল রেখে গেল। শরীর খারাপ হলে ওকে দিয়ে খবর দেওয়া যাবে ডাক্তারকে। ওদের গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল। এখন কি ঘুম আসবে? দরজা বন্ধ করতে ভয় পাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দেব? এই বন্ধ দরজার আড়ালে কী নাটক হবে আবার, কে-ই বা বলবে?

আজ চারপাশ একটু বেশি নির্জন। ঘরের আলো এত বেশি নিষ্প্রভ কেন! ঘরের আনাচকানাচে চোখ চলে যাচ্ছে। একা থাকতে ভাল লাগছে না। সত্যি বলতে, আমার এই চেনা বাড়ি মুহূর্তে অচেনা হয়ে গিয়েছে! ভয় করছে। খুবই ভীত আমি। আর্মস বার করে বালিশের নিচে রেখে শুলাম। ভুল করেই হোক, আর যেভাবেই হোক, কেউ আমাকে টার্গেট করেছে। প্রাণ বিপন্ন আমার!

ঘুম আসছে না। যা গেল, অভাবনীয়। একটু এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়লাম। মেয়েটা গেল কোথায়? আমাকে লুকিয়েই যদি পালাবি, তো এখানে এলি কেন? কেউ কি ওদের পাঠিয়েছে? লোকটার সঙ্গে মেয়েটার রিলেশন কী? এমন তো নয় যে দু'জনে মিলে লুঠপাট করতে এসেছিল? শিয়োর। এটাই ঠিক। ওরা একই গ্রুপের। একটা নাটক সাজিয়ে বাড়িতে ঢুকে লুঠ করে। সুবিধেও পেয়েছিল। আমার বাড়ি নির্জন গলির ভিতরে। কাল সন্দীপকে এই ধারণাগুলো জানাতে হবে।

সারারাত ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে থাকি। ঘুমাতে ভয় করছে। ফের কেউ বা কারা ঢুকে পড়বে না, তার নিশ্চয়তাই বা কী? জেগে থাকি আজ।

একটু পরে কড়া কফি বানিয়ে নিলাম। ঘটনার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। কে এরা? আমাকে ফলো করছে কি? বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছ। হয়ত ঝড় হচ্ছে। তারই উথালপাথাল শব্দে মনে হল, কারা এসে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বাইরে কেউ কি আছে? হাতে পিস্তল নিয়ে রাখি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না!

ঘড়ি দেখলাম। চারটে। ভোর হয়ে গিয়েছে। বাইরে অন্ধকার যদিও। বেলা দশটার দিকে থানায় যাব। লোকটা, অনির্বাণ বসুর চেহারার স্কেচ আঁকতে শিল্পীকে সাহায্য করতে হবে। মেয়েটার বর্ণনা চাইতে পারে থানা থেকে। স্কেচ করবে। মনে আছে মেয়েকে। খুব মনে আছে।

(৪)

থানায় পৌঁছাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল থানার শিল্পীর কাছে। এই থানায় শিল্পী আছে বলে জানতাম না। শুনলাম, প্রয়োজনে শিল্পীকে আনা হয় শিলিগুড়ি থেকে।

দেখলাম, ভদ্রলোক বসে বোধহয় আমার জন্য ওয়েট করছেন। সন্দীপ আমার সঙ্গে ছিল। ও শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমার ধারণা ঠিক। মেয়েটির ছবিও আঁকিয়ে রাখতে চাইল সন্দীপ। আমাকে সামনে রেখে ছবি আঁকা শুরু হল। আস্তে আস্তে অনির্বাণ বসু (অবশ্য যদি এই নামটা ঠিক নাম হয়) ফুটে উঠতে লাগল কাগজের উপর। আমার কথামতো শিল্পীর পেনসিল চলছিল। মেয়েটাকে ভাল

আধো অন্ধকারে প্রথমে কিছু দেখা যায় না। একটা আলোর ব্যবস্থা আছে। সুইচ অন করতেই চমকে গেলাম। ওই খুপরিতে কোনও উর্বশী, সুন্দরী তরুণী, রতিদেবী... কিস্‌সু নেই! কিচ্ছু নেই! মানে? মেয়েটা কোথায় গেল? এইখানে ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছি আমিই। কেউ জানে না এই গুপ্ত জায়গার কথা!

করেই লক্ষ করেছিলাম। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ আছে আমার। এ কথা অস্বীকার করার কারণ দেখি না। জীবনে নারী এসেছে বারবার। মেয়েটা ভারী সুন্দরী বলেই তো দরজা খুলেই থমকে গিয়েছিলাম। মনে আছে সুন্দরীর মুখ। আমার বর্ণনার পাশাপাশি চলল শিল্পীর হাত। আস্তে আস্তে মেয়েটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

একটা সময় শিল্পীর কাজ শেষ হল। সন্দীপ এসে লোকটির ছবি দেখে সন্তুষ্ট হল।

আমার কাজ শেষ। এবারে বাড়িতে ফিরে রেস্ট নেব। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। শান্ত জীবনে কেমনভাবে ঝড় এল ভাবছি। লম্বা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে সামনের দিকে। রাস্তার দু'পাশে এখন গাছের আকাল। উত্তরবঙ্গের এই চেহারা দেখে খারাপই লাগে। আগের মতো বৃষ্টি হয় না এখন। ছেলেবেলার সেই অরণ্যানি কোথায় আর!

ফোনের রিং টোন শুনে বুঝেছি রুক্মিণী। কেরালা থেকে ফিরেছে তাহলে! রেস্তরাঁ ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে। ডিভোর্সি। সারা বছর ঘুরে বেড়ানো ওর হবি। আমার সঙ্গে আলাপ দিল্লিগামী ফ্লাইটে। পরে ডুয়ার্স বেড়াতে এসে আমাকে গাইড করে বেড়িয়েছে। জলদাপাড়া টুরিস্ট লজের সেই বৃষ্টি-ঝরা রাতের কথা মনে পড়লে রুক্মিণীকে সে দিনের মতো কাছে পেতে ইচ্ছে হয়। লুকিয়ে থাকা বসন্ত পোষা বেড়ালের মতো গরগর করে। বুঝতে পারি, রুক্মিণী আমাকে শীতঘুম থেকে জাগতে সাহায্য করে!

—হ্যালো অ্যাফ্রোদিতি! বলো।

—আমি আসছি। টোয়েন্টি ফোর্থ। আদুরে গলায় জানাল রুক্মিণী।

—ওয়াও। এসো এসো। উফ্‌ফ, অনেক কথা জমে আছে! প্লিজ, তাড়াতাড়ি এসো।

—আসছি। শুনব তোমাকে। শোনাব তোমাকে!

আঃ! রাত বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অপেক্ষমাণ। উথালপাথাল হয়ে যাবে মেঘ আর মাটি। এসো রুক্মিণী, মাটি হাত বাড়িয়ে আছে দু'হাতে মেঘকে লুফে নেবে বলে। দু'জনে একসঙ্গে ভিজবে বলে!

রুক্মিণীর সঙ্গে কথা শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। ফোনের সুইচ অফ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মন টেন্‌স্‌ড হয়ে আছে। এর মধ্যে রুক্মিণীর কথা শীতার্ত রাতে মার্চ উইন্ড হয়ে এসেছিল খানিক আগে।

বাড়িতে ঢুকেই জামা-প্যান্ট ছুড়ে ফেলে দিলাম সোফার উপর। জুতোর দশাও একই হল। সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলাম। নিরাবরণ শরীর ছেড়ে দিলাম শাওয়ারের নিচে। ঠান্ডা জলের ধারায় অনেকক্ষণ ডুবে থেকেও অস্বস্তি যাচ্ছে না! উদোম গায়ে হুইস্কি নিয়ে বসলাম। আজ আমার মেড সারভেন্টকে দরকার নেই। ফোন করে দিলাম, ওকে আসতে হবে না। নিজের সঙ্গে থাকব খানিকক্ষণ। কবিতা পড়ব। ওহ্‌, ফোনটা করে রাখি। খুব দরকারি ফোন। নিরাপত্তা কার চাই না?

ঘুম পাচ্ছে! শরীর আর পারছে না মনকে টেনে নিতে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মোবাইল বাজছিল। ঘোর লাগা চোখ খুলে স্ক্রিনে তাকালাম। সন্দীপ! থানা!

—হ্যালো অফিসার, বলুন। কোনও খবর আছে?

—আপাতত নেই। আপনার কোনও অসুবিধে নেই তো?

—না না, ভাল আছি।

—ওকে, ফাইন। ফোন রেখে দিল

একটা লোক ছুটতে ছুটতে এল— ফিনিশ! খতম। শেষ হয়া গেসে। টেরাকটা এক্কেবারে পিষা দিসে মানষিটারে! উফ! রান ওভার হয়েছে। কেউ চলে গেল! একটু আগেও জানত না, ডাক এসে গিয়েছে! কে কখন যাবে, কেউ জানে না।

সন্দীপ। রুটিন খবর নেওয়া।

ঘুমটা চটে গিয়েছে। কাল রাত থেকে কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি। আজ না হয় হালকা কিছু খাব। খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

রেডি হয়ে বাইরে বার হলাম। কাছেপিঠে ভাল হোটেল নেই। একটা ধাবা আছে। সেটার উদ্দেশে যাচ্ছি। একটা রিকশ ধরে নিলাম।

ধাবায় রুটি খাব। মাংস নয়। রুটি-সবজি। অর্ডার দিয়ে বসতে যাচ্ছি, বেশ হইচই উঠল রাস্তার দিকে। টায়ার পাংচারের শব্দ পেলাম। লোকজন ছুটোছুটি করছে। কী হল? জঙ্গিটঙ্গি নাকি? যা সব হচ্ছে। সে দিন বাইক চোরদের যেভাবে মেরে ফেলা হল মেইন রোডে! চারজনের মধ্যে দু'জন পালাতে পেরেছিল। বাকি দু'জন...!

একটা লোক ছুটতে ছুটতে এল— ফিনিশ! খতম। শেষ হয়া গেসে। টেরাকটা এক্কেবারে পিষা দিসে মানষিটারে! উফ! রান ওভার হয়েছে। কেউ চলে গেল! একটু আগেও জানত না, ডাক এসে গিয়েছে! কে কখন যাবে, কেউ জানে না।

ভিড় জমছে। এগিয়ে যাই। কার ডাক এল আজ এখন। কারা সব চেঁচামেচি করছে। ফোনে পুলিশকে খবর দিচ্ছে একজন। দেখব না দেখব না করেও এগিয়ে গেলাম। মানুষের মধ্যে একটা হিংস্র কৌতূহল আছে। সেটারই জয় হল। ট্রাক পালিয়েছে। একজন গরম রক্তে মাখামাখি হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে আছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। অনির্বাণ বসু!

এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায়, ততই ভাল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে পাগল হয়ে যাব। এই লোকটার স্কেচ করিয়ে এসেছি ঘণ্টাখানেক আগে। এরই মধ্যে লোকটা ফিনিশ? কিন্তু আমি এখানে কেন? পুলিশ আমাকে এখানে, এই অনির্বাণ বসুর বডির কাছে দেখলে কোন সন্দেহের জালে জড়িয়ে ফেলবে, কে বলতে পারে? এই লোকটা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করবে না তো?

সাধারণ খুনের গল্পে যেমন হয়, যদি কারও সন্দেহ হয়, ট্রাকটা আমার ফিট করা ছিল! আর দেরি নয়। সকলের অলক্ষ্যে চলে এলাম ধাবার দিকে। এদিকে রিকশ পাওয়া যেতে পারে। বা ম্যাজিক টোটো। পুলিশ এসে এখানে আমাকে দেখলে কী ভাববে কে জানে! একটা রিকশ পেলে...! আমাকে চলে যেতে হবে।

—আপ কা রোটি-সবজি হো গয়া। ধাবার লোকটা ডাকছে।

অগত্যা ফিরতে হল। প্যাক করে দিতে বললাম খাবারটা। বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে সবজি ঠান্ডা হয়ে যাবে। মাংস নিলাম। মাইক্রোআভেনে গরম করে নেব।

লাকিলি রিকশ পেয়ে গেলাম। বাড়িতে পৌঁছে মেইন ডোর বন্ধ করে খাবারগুলো গরম করে নিলাম। বেসিনের কল খুলে হাত ধুতে ধুতে ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম। কোনও এক অনির্বাণ বসু গত রাতেই আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে কি কখনওই ভেবেছিল, আজ সে আর বেঁচে থাকবে না? হা হা হা! অনির্বাণ বসু রে! তোর কী হাল করেছি রে...। এই, চুপ চুপ! দেওয়ালেরও কান আছে!!

খাবার প্লেটে গুছিয়ে নিলাম। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। রুটিতে মাংসের গ্রেভি ভিজিয়ে মুখে দিয়ে বুঝলাম, খুব খিদে পেয়েছিল। ধাবার রান্না স্পাইসি হয়। ঝাল মাংস। এই সময় হাসি পেল। ঈশ্বর কী খেলা যে খেলেন, কেউ বলতে পারে না। এই চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস পরেছিলাম কাল, আর আজ সেই চেয়ারে বসে মাংস-রুটি খাচ্ছি!

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

তরঙ্গ উত্তরঙ্গ

৫৬

বৈঠকখানায় বসে নতুন কেনা রেকর্ডগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলেন গোপাল ঘোষ। সকাল আটটা বেজেছে। ন'টা নাগাদ তিনি গাড়ি চেপে বেরিয়ে প্রথমে যাবেন বজরা দেখতে। টাউনের দক্ষিণে পিলখানার ঘাটে থাকে তাঁর বজরা। ব্যবহার না করলেও সেটাকে ছাড়তে পারেননি তিনি। একবার বিক্রি করে দিয়ে দু'দিন পর আবার কিনে নিয়েছিলেন। চেনাজানারা কেউ কেউ ধার নিয়ে ব্যবহার করলেও যাকে বলে সত্যি করে কাজে লাগা — সেটা এদ্দিনে ঘটতে চলেছে। গগন আর বীরেন সে বজরা নিয়ে শিকারে যাবে। তাই সকাল সকাল নৌকো ঝেড়ে-মুছে চকচকে করে কিং সাহেবের ঘাটের কাছে করলা নদীতে কোথাও এনে রাখতে হুকুম দিয়েছেন। সেটা দেখতে যেতে হবে প্রথমে। তারপর আরও কাজকর্ম আছে।

গান শোনার ব্যাপারে যে গোপাল ঘোষের খুব একটা আগ্রহ আছে, এমন নয়। তবে রাইচাঁদবাবুর গাওয়া 'কাদের কুলের বউ' তিনি প্রায়ই শুনে থাকেন। কিন্তু নিতাইবাবুর মতে, রাগরাগিণী শুনলে নাকি শ্রোতা হিসেবে জাতে ওঠা যায়। উস্তাদ-পণ্ডিতরা সমঝদার শ্রোতা পেলে খুশি হন। আসলে গোপাল ঘোষের ইচ্ছে, বাড়িতে একবার মজলিশ বসাবেন। পুজোর মরশুমে টাউনে বেশ কিছু ভাল গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছেন। তাঁদের দু'-একজনকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা আসর বসাতে চাইছেন তিনি। এটা জানার পর নিতাই বলেছিল সমঝদার শ্রোতা হওয়ার কথা।

রেকর্ডগুলো দিনবাজার থেকে সেই উদ্দেশ্যেই কেনা। সংখ্যায় এক ডজন। টেবিলে গ্রামোফোন সাজিয়ে তিনি ভাবছিলেন, কোন গানটা আগে শুনবেন। বারোটার মধ্যে সাতটা আবদুল করিম খানের উস্তাদি গান। পাঁচটা গহরজানের ঠুংরি। গোপাল ঘোষ একখানা রেকর্ড তুলে নিয়ে লেবেলে লেখা রাগের নাম পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। ইংরেজি হরফে লেখা। উচ্চারণটা বেশ গোলমেলে। লেবেলের উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ঝিঝি— না না, ঝিঝিন্টি— এঃ! এ তো পড়াই যাচ্ছে না!'

বারান্দায় তখন কেউ এসেছে। গোপাল ঘোষ মুখ তুলে দেখে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে, আসুন আসুন! সকালে আসার কথা ছিল কি আজ?'

রমেশ গুপ্তভায়া গ্রামোফোন এবং রেকর্ডগুলোর উপর নজর বুলিয়ে বললেন, 'বলেছিলাম

যে, পুজোর বন্ধে যে ক'টা দিন পড়াতে আসব, সকালেই আসব।'

হিদারুর ছেলেকে পড়াতে সাধারণত সন্ধের পরেই আসেন রমেশবাবু। এই ক'দিন অবশ্য পুজোর কারণে আসেননি। কিন্তু সমস্যা হল, হিদারুর ছেলে আবার আজকে সকাল সকাল গিয়েছে বীরেনের বাড়িতে। রাতের বেলা নৌকো নিয়ে শিকারে যেতে যাতে সমস্যা কম হয়, সে জন্য ব্যাটারি আর আলোর দরকার। সেসব একটা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে হিদারুর ছেলে গিয়েছে সাতটা নাগাদ। মনে হয় না, খুব তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসবে।

রমেশ গুপ্তভায়া অবশ্য ছাত্রের অনুপস্থিতির কারণ জেনে রাগলেন না। গোপাল ঘোষ এর মধ্যে বিজয়ার প্রণাম সেরে ফেলেছে। ফলে মিষ্টিমুখ না করে রমেশবাবুর ফেরার উপায় নেই। তাই তিনি চেয়ারে একটু গা এলিয়ে বসে বললেন, 'তা এসব নতুন রেকর্ড বুঝি?'

'সব ওস্তাদি গানবাজনা।' গোপাল ঘোষ লজ্জিত মুখে বললেন, 'এসব আমি তেমন শুনিনি। কিন্তু সমঝদার শ্রোতা হতে গেলে না শুনলে চলবে কেন বলুন?'

'বটেই তো! তা চালান একখানা।'

'এতে রাগিণীর নামটা কী লেখা আছে বলুন তো?' গোপাল ঘোষ সেই রেকর্ডখানা এগিয়ে দিলেন রমেশবাবুর দিকে— 'নাম পড়তেই হোঁচট খাচ্ছি। গান কেমন হবে কে জানে!'

'ঝিঁঝোটি।' রাগের নামটা উচ্চারণ করে জানিয়ে দিলেন রমেশ গুপ্তভায়া। গোপাল ঘোষের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'এ রাগিণীর নাম শুনিইনি কখনও। এটাই বাজাই, কী বলেন?'

দম দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে রেকর্ড বসিয়ে দিলেন তিনি। বাতাসে মিহি কিন্তু মিষ্টি এবং অতি সুরেলা একটা কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল। রমেশ গুপ্তভায়া আপ্লুত হয়ে গেলেন। জেলা স্কুল আর ছাত্র পড়ানো নিয়ে কেটে যাওয়া জীবনে গানবাজনা শোনার অবকাশ আর হয় না বললেই চলে। আজ হঠাৎ পাওয়া এই অবসরে আবদুল করিম খানের স্বরের মাধুর্য তাঁকে দ্রবীভূত করে দিল। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বাঃ! আরেকটা চালান তো! এঁর গান আমি আগে শুনিনি। বড় পবিত্র লাগছে।'

মহা উৎসাহে গোপাল ঘোষ আরেকখানা আবদুল করিম তুলে নিয়ে বললেন, 'এটা চালাই। যমুনা কি তীর— রাগিণীর কি এত বড় নাম হয়?'

'আহা! ওটা গানের লাইন। এ গানটা আমি শুনেছি। ভৈরবী।'

শরতের উজ্জ্বল অথচ নরম আলোয় ভরা সকাল। সে আলোর আভায় বৈঠকখানার ঘরটাও ভরে উঠেছিল। ভৈরবীর উদাসী সুর সে আলোর সঙ্গে মিশে যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরময়।

তারপর সকাল দশটা নাগাদ করলার ধারে নোঙর করে রাখা বজরা দেখতে গোপাল ঘোষ যখন বার হলেন, তখন তাঁর বেসুরো গলায় বাজছে 'কাদের কুলের বউ'। খানিকক্ষণ উস্তাদি রাগিণী শোনার পর মিষ্টিমুখ করে চলে গিয়েছিলেন রমেশ গুপ্তভায়া। তিনি চলে যাওয়ার পর গহরজানের একখানা রেকর্ড এক মিনিট শোনার পর গোপাল ঘোষের মনে হয়েছিল, সমঝদার শ্রোতা হওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার। রমেশবাবু শোনামাত্রই বলে দিচ্ছিলেন, কোনটা কী রাগিণী বাজছে। গোপাল ঘোষের মনে হচ্ছিল, সুরগুলো সবই যেন অনেকটা একরকম। তাই একা একা আর সেসব শোনার সাহস পাননি তিনি। তার বদলে বার দশেক 'কাদের কুলের বউ' চালিয়ে তারপর গিয়েছেন স্নান করতে।

বজরাটা করলার পাড়ে ভাসছিল। কিং সাহেবের ঘাটে এসে তিস্তায় জলের বহর দেখে গোপাল ঘোষ নিশ্চিত হলেন। করলায় গোটা বছর বজরা ভাসাবার মতো জল থাকলেও এ সময়ে তিস্তায় ভরা জল পাওয়াটা ভাগ্যের। কাল সকালেই ফিরে আসবে গগনরা। ততক্ষণ জল খুব একটা কমবে না। তবে মেঘ হালকা হয়ে গিয়েছে। ও বেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

বজরার পাহারায় যে ছিল, সেই গনি ইসলামকে গোপাল ঘোষ চিনতে পারলেন। খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি আছ গনি? বেশ নিশ্চিন্ত হলাম। ছেলেমানুষের ব্যাপার। রাতের বেলা তিস্তা বেয়ে যাবে বলে একটু চিন্তা হচ্ছিল। তা তুমি যখন আছ, তখন আর চিন্তা কী?'

'বীরেনবাবু মানজার পাঠায় দিসেন।' গনি একটু দূরে থাকা একজনকে দেখিয়ে জানাল। তারপর গলা তুলে ডাকল, 'ও মানেজারবাবু! আসেন। বোটের মালিক আইসেন।'

ম্যানেজারটি এগিয়ে এসে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। গোপাল ঘোষ দেখলেন ব্যক্তিটি দেশি লোক। হাফ প্যান্ট পরেছে গ্যালেস দিয়ে। সাদা শার্ট। পায়ে জুতো আছে। লোকটিকে বেশ চটপটে দেখাচ্ছিল। বীরেনের এমন একজন ম্যানেজার আছে, সেটা অজানা ছিল গোপাল ঘোষের। তিনি নিজের জন্য ম্যানেজার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তক্ষুনি।

'আপনাদের রুটটা ঠিক কী বলুন তো?' গোপাল ঘোষ ম্যানেজারের আপাদমস্তক মেপে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেপুলেরা কিছু লুকাচ্ছে না তো?'

ম্যানেজার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন। টাউনের ছোট দারোগা বিনয় মুস্তাফি দুটো হাবিলদার সঙ্গে করে আসছেন। খানিক আগেই একবার এসেছিলেন তিনি। বোট কার, সেটা জেনে গিয়েছেন। এবার বোধহয় গোপাল ঘোষকে দেখেই আসছে।

'শুভ বিজয়া ঘোষবাবু!' মুস্তাফি হাত জোড় করে বললেন, 'এ বোট শুনলাম আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ যাবে?'

'পরিচিত দুটো ছেলে যাবে শিকারে। কাল সকালে ফিরবে।'

'ব্যাস ব্যাস! তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই।' মুস্তাফি মাথা নেড়ে জানালেন, 'আসলে ওদিক থেকে বেশ কিছু বিপ্লবী লুকিয়ে থাকার জন্য এদিকে আসছে বলে খবর আছে। আমার আবার তিস্তাটা দেখতে হয়। তা বোট যাবে কোন দিকে?'

'বিকেলের দিকে রওনা হবে। দোমোহানি পেরিয়ে খানিকটা উজানে যাবে বোধহয়।'

'তবে তো আমার সীমানাতেই থাকবে। আমি রাতে ডিউটিতে থাকব। আপনার বোট দেখে রাখব।'

গোপাল ঘোষ ভারী নিশ্চিত হলেন পুলিশের আশ্বাস পেয়ে। মুস্তাফি চলে যেতেই তিনি ম্যানেজারকে বললেন, 'আর কোনও চিন্তার ব্যাপার থাকল না তবে— কী বলেন?'

ম্যানেজার হাসলেন। যেন তিনিও খুব নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু পুলিশের ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা তাঁকে মোটেই খুশি করেনি। তবে আশার কথা হল যে, দু'-দু'বার এলেও থানার ছোটবাবু তাঁকে চিনতে পারেননি। গোপাল ঘোষেরও কল্পনাতীত ছিল যে, বীরেনের ম্যানেজার আসলে ছদ্মবেশী তারিণী বসুনিয়া। তাই তিনি এবার নিজের ম্যানেজার পাওয়া নিয়ে তারিণী বসুনিয়ার কাছে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন।

সে সময়ে খুদিদার বাড়িতে ডাক্তার অবনী গুহ নিয়োগীর ভুরুতে সামান্য চিন্তার ভাঁজ। শোভার জ্বরটা বাড়ছে। গর্ভাবস্থায় এমন জ্বর ভাল নয় খুব একটা। জ্বরক্লান্ত শরীরে শুয়ে থাকতে থাকতে শোভা দেখছে গগনেন্দ্রর চিন্তিত মুখ।

'কিছু হবে না। সেরে যাবে। তুমি শিকারে যেয়ো। একটা রাত্তিরেরই তো ব্যাপার।' বলল শোভা গগনেন্দ্রকে। তারপর গলা থেকে খুলে দিল বিপত্তারিণীর মাদুলি লাগানো সরু সোনার চেন। এটা গলায় থাকলে বিপদ আসে না। গগনেন্দ্র সেটা নিতে চাইছিল না। কিন্তু শোভাকে ফেরাতে পারল না সে। পরে নিল গলায়।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

যখন চ্যানেল নাক গলালেন...(২)

বাংলা মেগাসিরিয়ালের গপ্প লিখবেন? সে যতই মৌলিক লিখুন না কেন, প্রোডিউসার ঠিক বুঝে যাবেন যে সে গপ্প নকল। এস্কিমো ভাষায় আপনার গপ্পের মতোই একটা মেগা চলে। প্রোডিউসার দেখেছেন। ফলে গপ্প লেখার দায় নিয়ে এই সিরিয়ালের লেখক পড়লেন মহাফ্যাসাদে। যাঁর লেখার কথা, তিনি ছ'তলার গরাদহীন জানলায় বাইরের দিকে পা ঝুলিয়ে ফুটবল হাতে বসে ছিলেন এতক্ষণ। এবার দিলেন লাফ! না না বাপু! মেগার গপ্প লেখা যে-সে কথা নয়। পেলে পর্যন্ত হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে, আপনি কে? এরপরেও যদি লিখবেন, তবে এ পর্ব মন দিয়ে পড়ুন আগে।

—পড়েছ সবজান্তার হাতে, কাজ কি হবে পানতা ভাতে?

রূপকদার চেনা গলা শুনে আমি মুখ ফিরে তাকালাম। আর তাকাতেই, সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। কারণ, রূপকদা বসে আছেন তাঁর ছ'তলা ফ্ল্যাটের গরাদহীন জানালাটির পাটাতনে। আমার দিকে পিছন ফিরে, বাইরের দিকে দু'পা ঝুলিয়ে। এবং কোলে একখানা ফুটবল নিয়ে দু'হাতে জোর লোফালুফি খেলছেন। যাকে বলে, রীতিমতো ভয়ংকর দৃশ্য!

আমার গলা দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটা ককানি ধরনের শব্দ বেরিয়ে এল, যা শুনে রূপকদা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। এবং আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি মুচকি হেসে বললেন, চ্যানেল তো ধরেই নিয়েছে যে বাঙালির আর পানতা ভাতে রুচি নেই। সুতরাং তুমি নির্ভাবনায় হট ডগ সার্ভ করতে পারো! আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। তাই ঢোক গিলে বহু কষ্টে বললাম, কিন্তু গল্পটা লিখবেন তো আপনি... দাদা! এতদিন ধরে যে এত মিটিং হল? আগামী মাসের মধ্যে তো চ্যানেলকে পাইলট এপিসোড শুট করে দিতেই হবে!

জবাবে রূপকদা মাথা দুলিয়ে গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, সামিনা মিনা এহ এহ এহ, ওয়াকা ওয়াকা এহ এহ! সামিনা মিনা জাঙ্গেলওয়া... দিস টাইম ফর আফ্রিকা!

এবং পরমুহূর্তে জানালা দিয়ে বিরাট লাফ। জানালার ফ্রেম থেকে তিনি অদৃশ্য হতেই বাইরে থেকে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠের ক্রমশ ম্রিয়মাণ শেষ বাক্যটি... আমি ভাই চললাম সাউথ আফ্রিকা... ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করতে এ এ এ...

আধফোটা এক আর্ত চিৎকার কণ্ঠে নিয়ে, ধড়ফড়িয়ে এবং ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম আমি, আমার লেখার টেবিলে ল্যাপটপের সামনে। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল ল্যাপটপও। কি-প্যাডে আমার হাত লাগতে স্ক্রিনটি আলোকিত হল। সাদা পাতার প্রথম লাইনে লেখা... প্রোডাকশন নাম্বার ওয়ান, এপিসোড ওয়ান, সিন নাম্বার ওয়ান...। ব্যাস, তারপর বাকি পাতাটি বিলকুল ফাঁকা। ফাঁকা কারণ, এই নিয়ে সপ্তমবার আমাকে এই পাইলট এপিসোডটি পুনর্লিখন করতে হচ্ছে। ফলে অতি অত্যাচারে মাথাও ফাঁকা, পাতাও ফাঁকা। এবং এমনকি, রাত তিনটের সময়

কীসের আশা নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমি মনিটরে চেয়ে থাকছি আর কোন হতাশাতেই বা ঘুমে ঢুলে পড়ে পড়ে বিদঘুটে দুঃস্বপ্ন দেখছি... এই মুহূর্তে সেটার জবাব কেউ চাইলেও, আমায় পুরো ব্ল্যাঙ্কভাবে ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে থাকতে হবে। ভোম হওয়া অসাড় চেতনায় শুধু ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো কিছু তথ্য। যেমন...

(ক) রূপকদা দুম করে একটি নতুন প্রকাশিত সংবাদপত্রের হয়ে বিশ্বকাপ কভার করতে, পাক্কা এক মাসের জন্য সাউথ আফ্রিকা চলে গেলেন।

(খ) সেই সুবাদে বাধ্য হয়ে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। দু'দিন পরেই ছিল চ্যানেলে মিটিং। রাত জেগে জেগে তার আগেই পাইলট এপিসোডখানা নিজেই লিখে বসলাম।

(গ) কার লেখা, সে নিয়ে বাক্যব্যয় না করে চ্যানেলের এগজিকিউটিভদের সামনে তা পড়ে শোনালাম নির্দিষ্ট দিনে। সে চিত্রনাট্য যথেষ্ট বাহবা অর্জন করার পরেই, চ্যানেলের কাছে আসল সত্যটি ফাঁস করা হল।

কিন্তু এত অবধি সব ঠিকঠাক চলা সত্ত্বেও, কপালে নেই হ্যাপি এন্ডিং। বরং কলম পেষাই হয়ে চলেছে নেভার এন্ডিং। কারণ এর হপ্তা বাদেই সেই চিত্রনাট্য বাতিল। সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা গল্পের ভিত্তিতে পুনর্বার পর্বটি লেখবার নির্দেশ দিলেন চ্যানেলের প্রোগ্রামিং হেড।

সেইমতো লেখা হল। পড়ে শোনাতে উনি বললেন, বেশ হয়েছে। কিন্তু এরপর যখন শুটিং-এর প্রস্তুতি হিসেবে কলাকুশলী নির্বাচন চলছে, তার মধ্যেই হঠাৎ চ্যানেলে জরুরি তলব। গিয়ে হাজির হতে দেখি, প্রোগ্রামিং হেডের ঘরে বসে রয়েছে চিত্রগ্রাহক সৌম্যক। প্রোগ্রামিং হেড আমাকে দেখে সহাস্যে বললেন, সৌম্যক একটা দারুণ সিন ভেবেছে আমাদের গল্পটার জন্য। শুনে আয়্যাম রিয়েলি এক্সাইটেড। আমি ভাবছি, পাইলট এপিসোডটা ওকে দিয়েই শুট করানো যাক।

তারপর, প্রায় ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে থাকা সৌম্যকের উদ্দেশে বললেন, কই, সিনটা একবার শোনাও ওকে। সেইমতো বাকি এপিসোডের গল্পটা ওকে অ্যাডজাস্ট করে রিরাইট করতে হবে তো!

আমি প্রমাদ গুনলাম। কিন্তু কিছু করারও নেই। কারণ ততদিনে বুঝে গিয়েছি, এ হল কর্তার ইচ্ছেয় কর্মসম্পাদনের অনিবার্য ক্ষেত্র। সে দিনই আমি লক্ষ করলাম যে, সৌম্যক কখনও পুরো চোখের পাতা মেলে তাকায় না। অর্ধনিমীলিত চক্ষে সে চিবুক উঁচু করে কোনওমতে আমার চোখে চোখ রাখল। তারপর খসখসে গলায় বলল, পিয়ারলেস ইন হোটেলের একদম টপ ফ্লোর থেকে কলকাতার ভিউটা কল্পনা করে নাও। ওয়াইড ভিউ... শহিদ মিনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গা, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ! সেসবের উপর দিয়ে প্যান করে ক্যামেরা কুড়িতলা বাড়ির ছাদের দিকে ফিরল। ছাদে এক একাকী ছায়ামূর্তি। আমাদের নায়ক। জোর হাওয়ায় মেঘ উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই ছাদ থেকে আমাদের নায়ক ঝাঁপ দিল...। তারপর বাড়ির গা বেয়ে লোকটা পড়ছে, পড়ছে পড়ছে...

আমার অজান্তেই আমার দুটো হাত ক্যাচ ধরার জন্য উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে তার বর্ণনা শুনে। কোল থেকে প্যাড আর কলম খসে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে। আর সেই শব্দেই হয়ত সৌম্যকের কনসেনট্রেশন ভঙ্গ হয়ে থাকবে। বর্ণনা থামিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ প্রোগ্রামিং হেড-এর দিকে ফিরে তাকাল সে। তারপর খুব সংক্ষেপে বলল, আমার ফাইট মাস্টার জুডো রামুকে চাই। আর মুম্বই থেকে হাই স্পিড ক্যামেরা... ওয়েবক্যাম... বুক করতে হবে।

এদের সংস্পর্শেই আমরা প্রাইভেট প্রোডিউসাররা দিনের পর দিন ধরে, কখনও হিল্লোলিত হই তো কখনও আন্দোলিত হই। হাসি, রাগ, ঝগড়া, ভালবাসা, নিন্দা, অভিনন্দনখচিত এক বহুবর্ণ সংসার, যার মেয়াদ সেই চ্যানেলে যতদিন সিরিয়াল চালু থাকবে, ততদিন অবধি।

সিরিয়াল নিয়ে প্রথমবার ক্রিয়েটিভ মিটিং-এ আমার যোগদান, সেরকমই এক সর্বভারতীয় কর্পোরেট চ্যানেলের বাংলা বিভাগের দপ্তরে। বাংলায় আগমনের বছর দেড়েকের মধ্যেই সে চ্যানেল তখন পুরনো আর সব চ্যানেলের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে। কারণ বাংলার সর্বপ্রান্তে দর্শকরা ঝপাঝপ দলবদল করে চলে আসছে এই নতুন চ্যানেলের দিকে!

ইএম বাইপাসের ধারে একটি শপিং মলের পাঁচতলায় তখন তাদের অফিস। প্রকাণ্ড হলঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল, চারপাশে কিউবিকল থাকলেও, ঘরের মাঝখানে একদম ফাঁকা একটু জায়গা। আর সেখানে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে

প্রোগ্রামিং হেড আমাকে দেখে সহাস্যে বললেন, সৌম্যক একটা দারুণ সিন ভেবেছে আমাদের গল্পটার জন্য। শুনে আয়্যাম রিয়েলি এক্সাইটেড। আমি ভাবছি, পাইলট এপিসোডটা ওকে দিয়েই শুট করানো যাক। তারপর, প্রায় ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে থাকা সৌম্যকের উদ্দেশে বললেন, কই, সিনটা একবার শোনাও ওকে।

বলাই বাহুল্য, প্রোগ্রামিং হেড সে কথায় সাগ্রহে সায় জানিয়ে মাথা নাড়লেন। আর আমি, অদৃশ্য হাতে কপাল চাপড়ালাম। কারণ বুঝতেই পারছিলাম, ভোগান্তির চূড়ান্ত হতে চলেছে। কিন্তু সে কথায় যাওয়ার আগে, আরেকটু পিছিয়ে যাই চলুন। দয়ালু সন্ন্যাসী প্রথমবার বাঁচিয়ে দেওয়ার পরে ইঁদুর কী করে ধাপে ধাপে বেড়াল থেকে বাঘ হয়ে একদিন খোদ সন্ন্যাসীকেই গিলতে গিয়েছিল, আমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা তো আসলে খানিকটা সেরকমই!

একটা চ্যানেলের বহু মাথা, বহু কর্মী। মাথার লিস্টির মুখ্য ভাগে রয়েছেন বিজনেস হেড, প্রোগ্রামিং হেড, ফিনান্স হেড, রিজিয়নাল হেড প্রমুখ। আর কর্মী বলতে গেলে শুরু করতে হয় একদম গেটের সিকিয়োরিটি গার্ড থেকে। তারপর রিসেপশনের দিদিমণি। তাকে পেরিয়ে, কার্ড পাঞ্চ করা গেটের ওপারে, এগজিকিউটিভ প্রোডিউসারগণ, বিল এবং চেক পাশ করা দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তাগণ এবং চা পরিবেশনকারী সদাহাস্যময় বেয়ারাবাবু অবধি, সে আরেক লিস্টি। মোটের উপর, একখানা রীতিমতো সচল ক্যারম বোর্ড! ঘর ভরতি ছেলেমেয়েরা কাজ করার ফাঁকে, দিব্যি দু'-এক দান ক্যারম পিটিয়ে এনার্জি রিচার্জ করে নিতে পারে আর কী! কাজের জায়গার মধ্যেই এমন একটা জ্বলজ্যান্ত কলেজের ক্যান্টিন ধরনের পরিবেশ বিরাজ করছে দেখে মনে মনে তারিফ করে বলতেই হল... বাঃ, কী আধুনিক ভাবনা!

—আমরা সব দিক থেকেই অতি আধুনিক। আর সেই জন্যেই আমরা নাম্বার ওয়ান!

খানিক বাদে চ্যানেলের প্রোগ্রামিং হেড এই বলে, তাঁর কামরায় বসে মিটিং আরম্ভ করলেন।

—আর সব চ্যানেল গল্প বলে। কিন্তু আমরা বলি, চরিত্র। এমন এমন সব চরিত্র, যাদের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না দর্শকের নিত্যজীবনের অঙ্গ হয়ে পড়ে। লোকে সিরিয়ালের নাম মনে না রাখুক ক্ষতি নেই। কিন্তু চরিত্রের নাম যেন তাদের মাথার ভিতর অতি গভীরভাবে বাসা বাঁধে। ফলে, রোজ রোজ সেই চরিত্রের হাঁড়ির খবর জানতে আমাদের চ্যানেলে তারা টিউন ইন

করতে বাধ্য!

শুনতে শুনতে ক্রমে মনে হতে লাগল, ওই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আমি যেন কোনও অতি প্রাকৃত বশীকরণ মন্ত্র সৃষ্টির ফর্মুলা শিখছি!

তখন কে জানত যে, ওটা ছিল সবে বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ। প্রথম এক কাপ কালো কফি সহযোগে সেই যে ক্লাস শুরু হয়েছিল... তারপর গোটা সেশনটাই কেটে গেল চোদ্দোবার সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে হয়ে। এবং দু'মাসে, অন্তত এক-চতুর্থাংশক ক্যাসপিয়ান সাগরসম কফি পান করা হয়ে গেল। অগণিত মিটিং সামলে (এবং সাঁতরে) শেষ অবধি, পূর্ববর্ণিত 'খিদিরপুরে শুটিং পর্বের' ডাঙায় যখন এসে পৌঁছেছিলাম, ব্ল্যাক কফির নাম শুনলেই ততদিনে অল্প অল্প শিউরে উঠি! সুতরাং এই সূত্রে আমার ছোট্ট একটি টিপ্পনী দেশের কফি ইন্ডাস্ট্রির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলদের অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ!

এবারে দেখা যাক, 'গল্প নয় চরিত্র চাই' নীতিতে বিশ্বাসী এই চ্যানেল নতুন সিরিয়ালের কর্মসূচি কীভাবে নির্ধারণ করেন। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে দেখেছি, অধিকাংশ চ্যানেলেরই কয়েকটি বাঁধা 'লব্জ' আছে। আপনি যেই জানতে চাইবেন, কী বিষয় নিয়ে সিরিয়াল করতে চান... তাঁরা নিরীহ মুখ করে বলবেন, আমরা বলব কেন? আপনারা বলুন কী সাবজেক্ট নিয়ে এসেছেন?

আপনি ভীষণ খুশি বোধ করলেন। উত্তেজিত হয় ভাবলেন, বহু রাত জেগে যে মাস্টারপিস কাহিনিটি গর্ভে ধারণ করেছেন, এবার তাহলে সেটি সাড়ম্বরে দিনের আলো দেখবে। আহা, কী আনন্দ! চলতি সিরিয়ালগুলোর থেকে একেবারে আলাদা... একদম অরিজিন্যাল একটি গল্প নিয়ে, আপনার ইনিংস শুরু হতে চলেছে।

তবে আমি বলব, যতই তেড়েফুঁড়ে গল্প পড়ে শোনান না কেন... আগে থেকেই কিন্তু জেনে রাখুন যে, নিট ফল শূন্য হবে। কারণ চ্যানেলের সংবিধান মতে, ফার্স্ট রাউন্ড ইজ অলওয়েজ ফল্স রাউন্ড। সুতরাং মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। ফার্স্ট রাউন্ডে দুটো, তিনটে কি চারটে পর্যন্ত কাহিনির সারসংক্ষেপ আপনাকে বকে যেতে হতে পারে, একসার ভাবলেশহীন মুখের সামনে। তারপর সবে বলেটলে যখন আপনার গলা শুকিয়ে কাঠ, তখন কাঠের পুতুলের মতো নিশ্চল মানুষগুলো নড়েচড়ে উঠবেন। এবং একযোগে ঘাড় দুলিয়ে আপনার বলা সব ক'টা গল্পই নির্ঘাত নাকচ করবেন। আর তার কারণ দর্শাতে কাষ্ঠহাসি হেসে বলবেন, ইট'স টু রিস্কি। মনে হচ্ছে না, মহিলা দর্শকরা এইসব গল্পে ইন্টারেস্ট পাবে... আপনি তর্কবাগীশ হলে চেষ্টা করতে পারেন তর্ক করার। আপনার গল্পের আশ্চর্য গুণগুলোর দিকে ওঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রাণান্তকর শেষ চেষ্টা করেও দেখতে পারেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। তাতে বরং ওরা সোজা বাউন্সার ছুড়বে আপনার মাথা লক্ষ্য করে। বলবে, লোকে কেন এই গল্পটা দেখতে চাইবে, আপনি সেটা বোঝান দেখি যুক্তি দিয়ে!

ভাবুন তবে, কেমন নির্দয় এই ব্যক্তিগণ। সোজাসুজি বললেই হয় যে গল্পটা পছন্দ হয়নি। জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো গল্প প্রমাণ করে দেখাতে বলার কোনও মানে হয়? নাকি ওভাবে আদৌ কিছু প্রমাণ করা যায়?

এবারে ধরুন, আপনি তর্কের লাইনে গেলেন না। বরং পথ ধরলেন বিকল্প গল্প শোনাবার। মহিলা দর্শকদের পছন্দসই গল্প চাই? তা বেশ, শুনুন তবে...। আপনি পুরনো

আর হ্যাঁ, আরেকটা জরুরি জিনিস এখান থেকে শিক্ষণীয়। 'অন্য একটি সিরিয়ালে এরকমই একটা গল্পের ট্র্যাক চলছে।'— এই বাক্যটি আসলে একটি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। এর অর্থ হল, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ওই চ্যানেলের কোনও চালু বা আপকামিং নতুন সিরিয়ালের গল্পে, আপনার থেকে শোনা এই বিষয়টি ওঁরা চুপিচুপি টুকে টুকিয়ে দিতে পারেন!

বাংলা সিনেমা কিংবা দিকপাল বাঙালি লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসে মেয়েদের যে ধরনের ক্রাইসিস সংবলিত কাহিনি দেখেছেন বা পড়েছেন, তার অনুপ্রেরণায় তাৎক্ষণিক কোনও স্টোরিলাইন মুখে মুখেই বানিয়ে বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আপনাকে শেষ অবধি পৌঁছাতে দিচ্ছে কে! তার আগেই আবার ওঁরা ঘাড় দুলিয়ে আপত্তি জানাবেন। আপনাকে থামিয়ে দিয়ে বলবেন, না না, আজকাল অন্য একটি সিরিয়ালে ঠিক এরকমই একটা গল্পের ট্র্যাক চলছে। এরকমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমি বেশ কয়েকবার থতমত খেয়ে গিয়েছি। কারণ হাজার মাথা খাটিয়েও তখন মনে করা যায়নি, কোনও সিরিয়ালে সত্যিই এমন অ্যাঙ্গলের স্টোরি ট্র্যাক চলছে কি না। কিন্তু চ্যানেল কর্তাদের মুখের উপর যদি বলি, বাংলায় মোটেও এমন গল্প কোথাও চলছে না... তার পরিণাম আরও ভয়াবহ। ওঁরা তখন স্মার্টলি বলবেন, বাংলার কথা কে বলছে? আমরা হিন্দি সিরিয়ালের কথা বলছি... মালয়ালম, পর্তুগিজ বা কোরিয়ান সিরিয়ালের কথা বলছি। আপনি জানেন, সেখানে কী চলছে, কী না চলছে? আমাদের সারা বিশ্বের সিরিয়াল দেখতে হয়। তাই, আমরা জানি!

সুতরাং যা কিছুই করুন, প্রথম রাউন্ডে আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। এবং স্কোরটা এক শূন্য করার জন্য এরপর চ্যানেল আপনাকে নিজেদের ভেবে রাখা কোনও একটা সাবজেক্ট দিয়ে বলবে, এটার উপর ভাল করে একটা গল্প লিখে আনুন দেখি। পরের মিটিং-এ একটা হেস্তনেস্ত করা যাবে।

আর হ্যাঁ, আরেকটা জরুরি জিনিস এখান থেকে শিক্ষণীয়। 'অন্য একটি সিরিয়ালে এরকমই একটা গল্পের ট্র্যাক চলছে।'— এই বাক্যটি আসলে একটি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। এর অর্থ হল, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ওই চ্যানেলের কোনও চালু বা আপকামিং নতুন সিরিয়ালের গল্পে, আপনার থেকে শোনা এই বিষয়টি ওঁরা চুপিচুপি টুকে টুকিয়ে দিতে পারেন!

যা-ই হোক, এগুলো সবই ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা। ওই দিনের মিটিং-এ অবশ্য চ্যানেলের প্রোগ্রামিং হেড এসব ভণিতার ধারকাছ দিয়ে যাননি। উনি সরাসরি বলেছিলেন, আমি একটা বিষয় অলরেডি ভেবে রেখেছি। বাংলা সিরিয়ালের জগতে এটা একটা মাইলস্টোন হতে পারে।

মাইলস্টোন শুনে নড়েচড়েই বসতে হল। কারণ আমার মনে হতে লাগল যে, গতানুগতিকতার বাইরে কিছু একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। তাই আমি তখন বেশ আবেগের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই হবে! আমরা জানপ্রাণ লড়িয়ে দেব তার জন্য। কী সাবজেক্ট ভেবেছেন, আর কী করতে হবে বলুন?

—আমি আসলে একটা পুরুষকেন্দ্রিক সিরিয়ালের আইডিয়া ভেবেছি...

এই কথা শুনেও বেশ ভাল লাগল। কারণ তখন যাকে বলে, 'শাশুড়ি-বউমা' ডুয়েল লড়াইয়ের রীতিমতো স্বর্ণযুগ চলছে প্রাইভেট চ্যানেলগুলোয়। আর ঈশান কোণে একটু একটু করে উঁকি দিচ্ছে 'এক স্বামী, দুই বিয়ে' নামক পরবর্তী আকর্ষণ। সেই পরিস্থিতিতে পুরুষালি সিরিয়ালের কথা যিনি ভাবেন, তাঁকে বাহবা দিতেই হয়। মনে মনে হাততালি দিয়ে আমি বললাম, বাঃ। তবে তো বেশ 'হট্‌কে' হবে ব্যাপারটা। এই মুহূর্তে কোনও চ্যানেলেই এমন সিরিয়াল নেই...

চ্যানেল হেড তাঁর বিরলকেশ হেডটি

সামান্য দুলিয়ে আমার কথায় সম্মতি জানালেন। তারপর প্রবলভাবে বোতাম টিপে কালো কফি আহ্বান করতে করতে বললেন, আমি চাই, এই হিরোর মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তার ব্যাপার থাকবে। একদিকে সে সমাজের মান্যগণ্য মানুষ... মানে ধরো একজন দারুণ নামকরা সার্জেন... টাকাপয়সা, সুন্দরী বউ, সন্তান... কিছুর অভাব নেই...

—আর অন্য দিকে?

চ্যানেল হেড আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেলেন, কারণ ঘরের দরজা ঠেলে বেয়ারাটি এসে ঢুকেছে। সে জানতে চাইল, কফি স্যার?

চ্যানেল হেড একই সঙ্গে যেন দু'জনের উদ্দেশেই বললেন, ব্ল্যাক!

আমি সন্দেহের সুরে বললাম, ব্ল্যাক মানে... আপনি ডার্ক শেডসের কথা বলছেন কি?

—অ্যাবসোলিউটলি!

উনি টেবিলে একটা থাপ্পড় কষালেন। উত্তেজনায় চোখ জ্বলজ্বল করছে। তারপর বললেন, রক্তলোলুপ! এই লোকটা মার দিতে এবং মার খেতে সমান ভালবাসে। দ্যাট'স হিজ আদার সাইড। পরিবার, প্রিয়জন, সবার অগোচরে লোকটা গোপনে সেই ইচ্ছে পূরণ করে বেড়ায় রাতের পর রাত... শুনে আমি শিহরিত। মফস্‌সলের ছেলে হলেও, জলপাইগুড়ির আজাদ হিন্দ লাইব্রেরি বা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির স্টকে থাকা এরকম বহু ইংরেজি থ্রিলার পড়েছি। বাংলা সিরিয়ালের জন্য কেউ এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করার প্রস্তাব দিতে পারে— এ আমার স্বপ্নেরও অতীত। কারণ টেলিভিশনের জন্য লেখা আমার প্রথম স্ক্রিপ্টটাই ছিল এমন ডুয়াল পারসোনালিটির এক চরিত্র নিয়ে। কিন্তু টেলিফিল্মের ডিরেক্টর সাহস পাননি অমন জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে। ফলে সেবার অন্য গল্প নিয়ে নতুন করে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়েছিল। এবার কি তাহলে আমার সেই সযত্নে লালিত স্বপ্ন সত্যি হবে?

—তবে এমন গল্প লেখার মতো লোক বাংলায় পাওয়া সহজ নয়...

প্রোগ্রামিং হেডের পরবর্তী সংলাপে সংবিৎ ফিরল আমার। ঠোঁট কামড়ে ভাবলাম, তা-ই তো বটে। চ্যানেল চট করে আমার মতো অখ্যাত কাউকে থোড়ি লিখতে সুযোগ দেবে! সরাসরি চান্স পাওয়া তো জাস্ট অসম্ভব। এক যদি ফাঁকফোকর পেয়ে ফোর্সড এন্ট্রি নেওয়া যায়। সুতরাং আপাতত ধৈর্য ধরে সেরকম সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

—রূপক সাহা বেশ কিছু ভাল থ্রিলার লিখেছেন। তোমরা একবার ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখো। সে দিনের মিটিং শেষে প্রোগ্রামিং হেড আমাকে এই নির্দেশ দিলেন, যার ফলে সুযোগ পেলাম এই ক্রীড়া সাংবাদিক এবং লেখক মানুষটির সান্নিধ্যে আসার। খুবই বন্ধুভাবাপন্ন একজন মানুষ তিনি। দিনের পর দিন তাঁর লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে আমি একাই চলে যেতাম সন্ধের পরে। চ্যানেল মিটিং-এর নোটস দেখে দেখে গল্প ব্রিফ করা এবং তৎপরবর্তী দীর্ঘ আলোচনায় কীভাবে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত, টেরই পেতাম না।

—তোমার বউদি তো আমার সঙ্গে বসে সিরিয়াল দেখতেই চায় না...। কেন জানো? প্রথম দিনই গল্পের ফাঁকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন রূপকদা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?

উনি আবার হেসে উঠে বলেছিলেন, আমি যে আগে থেকেই বলে দিই, এরপর কী ঘটতে চলেছে!

ওঁর এই দূরদর্শিতা বোধহয় চ্যানেলের মতিগতির ক্ষেত্রেও খেটে যাচ্ছিল। কারণ সমস্ত ব্রিফ শোনা সত্ত্বেও, কাগজে-কলমে একটি লাইনও আমি তাঁকে দিয়ে লেখাতে পারিনি। বরং উনি আমাকে নিজের লেখা দু'-তিনটি প্রকাশিত উপন্যাসের কপি দরাজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো পড়ে দেখো। তোমরা তো সিনেমা প্রোডিউস করো। দেখো, হয়ত কাজে লেগে যেতে পারে।

বইপোকা আমি মহাখুশি হয়ে সেই বইগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেলেছি। কিন্তু বইপ্রাপ্তির পিছনের প্রচ্ছন্ন বার্তাটি ধরতে পারিনি। রূপকদা আসলে বলতে চেয়েছিলেন যে, এই তৈরি গল্পগুলো থাকতে কেন তিনি চ্যানেল নির্দেশিত কোনও কাহিনিসূত্র ধরে গল্প লেখার ফাঁদে জড়াবেন?

চ্যানেল কর্তা অবশ্য সেই গল্পগুলোকে বিশেষ পাত্তা দিলেন না। তাঁর একই গোঁ। ডুয়াল পারসোনালিটি নিয়েই গল্প চাই। রকমসকম দেখে রূপকদা সঠিক সময়ে বিশ্বকাপ কভার করতে এক ঝটকায় একেবারে দেশের বাইরে চলে গেলেন। এদিকে আমি বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে বোকার শ্রম করে ছ'বার-সাতবার ধরে একটাই এপিসোড লিখে লিখে হন্যে হয়ে যাচ্ছি। বোধহয় দয়াপরবশ হয়েই একদিন চ্যানেলের এক এগজিকিউটিভ প্রোডিউসার একটি ডিভিডি দিলেন আমাকে দেখার জন্য। বললেন, লেখার আগে দেখাটা জরুরি। এটা দেখো, তোমার কাজে লাগবে।

সেটা ছিল বিবিসি-র একটি শর্ট সিরিজ। দেখতে গিয়ে দেখলাম, ও হরি! প্রোগ্রামিং হেড এতদিন ধরে এই গল্পটাই তো বেমালুম নিজের ভাবনা বলে চালিয়ে যাচ্ছেন!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

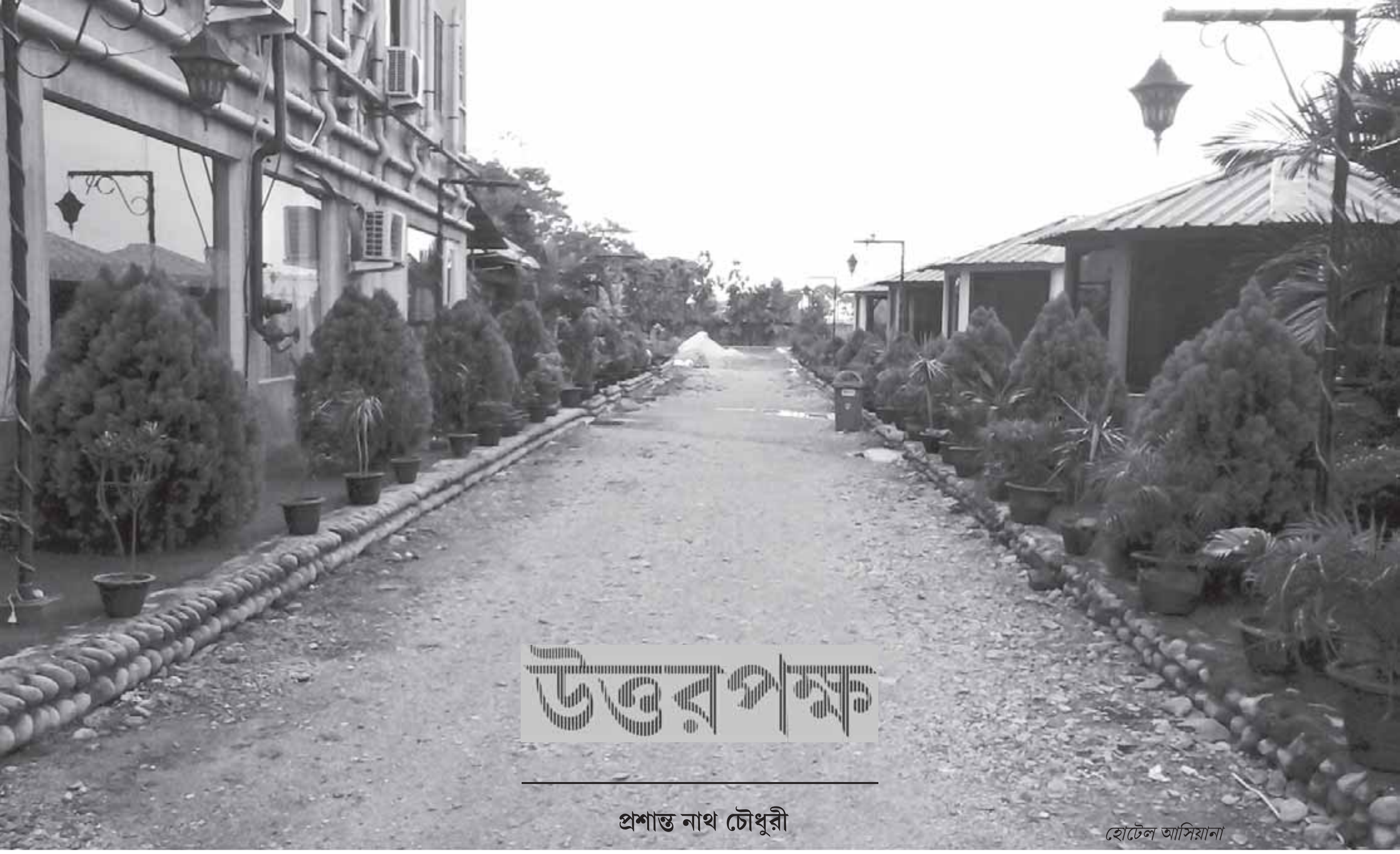

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

হোটেল আসিয়ানা

হাইওয়ে ধাবা পরিক্রমা

বাইরে খাওয়ার অভ্যেস বাড়ছে ডুয়ার্সেও

আমাদের ছেলেবেলায় দুর্গা পুজোর সময় একদিন 'নিরালা' রেস্টুরেন্টে বসে মোগলাই পরোটা খাওয়ার প্ল্যান তিন-চার বন্ধু মিলে ঠিক করা হত। যদি কিছু রেস্ত জোগাড় হত, তবে একদিন কদমতলায় 'সোসাইটি' রেস্তরাঁতে কাটলেট খাওয়া হত। মোগলাইয়ের সঙ্গে আলুর তরকারি ও কাঁচা পেঁয়াজ, ওদিকে কাটলেটের সঙ্গে সরষের চাটনি ফ্রি ছিল। ধীরে ধীরে নিরালার রমরমা বন্ধ হল এবং সোসাইটি মৃতপ্রায়। অতীতে জলপাইগুড়ির ওই দুটো রেস্তরাঁতে চপ, কাটলেট, কবিরাজি ইত্যাদির বেশ সুনাম ছিল। তা ছাড়া রেস্তরাঁ দু'টিতেই ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল দারুণ চালু। সাতের দশক পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে বাইরের অতিথিরা রুবি বোর্ডিং-এ আস্তানা গাড়ত। ওদের হোটেলের নানা সংস্কার, স্থানান্তর সত্ত্বেও ট্র্যাডিশন বজায় রেখে কাঁসার থালায় শাক, দু'-তিনরকম ভাজা, মোচার ঘণ্টসহ পাবদা, চিতল বা কাতলা মাছের ঝোল এখনও অনবদ্য। সবচেয়ে বড় কথা, এত ভাল খাওয়া, কিন্তু মূল্য নাগালের মধ্যে। আমার ফৌজি বন্ধু আশিস পুজোর

দিনগুলোতে রুবি বোর্ডিং-এ পাত পাড়ত।

১৯৬৮ সনের ৪ অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যার পর শহরের উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষজনের আনাগোনা কমতে থাকল। চা-বাগানের হেড অফিসগুলো তখন কলকাতামুখী। এ এক আশ্চর্য প্রতিবাদহীন শহর। কী পেলাম, কী হারালাম, তার হিসেব বোধহয় এখনও করে না।

প্রগতির স্বাভাবিক নিয়মে শহরে বেশ কিছু দোকানপাট হল। তা ছাড়া জেলা শহরের কোর্টকাছারিতে মানুষের আনাগোনা ছিলই। তবে এই শতাব্দীপ্রাচীন শহরের অন্যতম একমাত্র 'বিভাগীয় শহর'। শিলিগুড়ির সন্নিকটে 'উত্তরকন্যা' উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র— স্বাভাবিক কারণে জলপাইগুড়ির গুরুত্ব হ্রাস পাবে। তবে শহরটার একটা আশীর্বাদ ছিল, এই শহর শান্তির শহর এবং লেখাপড়ার শহর। বহু মানুষ চাকরিগত কারণে এই শহরে

এসেছেন— তারপর এই শহরকে ভালবেসে এখানেই স্থায়ী আবাস তৈরি করেছেন। প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগে একদিন বিকেলে কদমতলা মোড়ে ছেলেবেলার বন্ধু অশ্রুর সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম। কথায় কথায় ওকে বলেছিলাম, 'এই মোড় দিয়ে এখন যতজন যাতায়াত করবে, তার মধ্যে যদি অর্ধেক মানুষকে তুই চিনতে পারিস, তবে বুঝব তোর পপুলারিটি। সময় দশ মিনিট।' আসলে ও সাইকেলে চেপে সারা শহর চক্কর কাটত, প্রতি পাড়াতেই ছিল বন্ধুবান্ধব। আমি সে দিন আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম, কদমতলার মোড় দিয়ে যাঁরা যাচ্ছিলেন, তার অর্ধেকের বেশি মানুষ অশ্রুর পরিচিত।

আজ বিকেলে রাস্তায় চলতে গিয়ে দেখি অপরিচিত মানুষের মিছিল। আজ প্রবীণ অশ্রুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে দিনের বাজি পুনরাবৃত্তি করলে অবশ্যই অশ্রু হেরে যেত। শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে, পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয়েছে আবাসন, শপিং মলের সংখ্যা ডজন ছুঁইছুঁই। জলপাইগুড়ির আদি বাসিন্দারা রেস্তরাঁবাজিতে হয়ত শামিল ছিল না। আজকের প্রজন্ম কিন্তু ভিড় জমায় শহরের রেস্তরাঁগুলোয়। বিগত পনেরো বছরের মধ্যে শহরে ঝাঁ-চকচকে হোটেল-রেস্তরাঁ তৈরি হয়েছে। কোথাও সন্ধ্যাকালীন চটুল গানের সঙ্গে সুরার মৌতাত। নামী হোটেলগুলোর মধ্যে ডি লা প্রীতম, রত্নদীপ, তিস্তা, পর্যটক আবাস, অতিথি, শালিমার এবং টিউলিপ ইত্যাদি হোটেলগুলোর নাম মনে আসে। দুপুরের আহারের জন্য শচীনবাবুর যাযাবর হোটেল বিখ্যাত। একপাশে তিস্তার বাঁধ, অন্য পাশে জলপাইগুড়ির ডিএম অফিস। শুধুমাত্র কেজো মানুষরা গ্রাহক নয়— শখ করেও বেশ কিছু মানুষ দুপুরে যাযাবর হোটেলে আহার সারেন। অশীতিপর শচীনবাবুর বাজার করাটাও দর্শনীয়। বড় বড় ব্যাগ হাতে দিনবাজারে আসেন— বাজারের সবচেয়ে ভাল ইলিশ, চিতল, আড়, চিংড়ি, পাবদা, কাতলের তিনিই খরিদ্দার। সেই মাছ বাজারের পছন্দমাফিক পিস করে কাটিয়ে, টাটকা আনাজপাতি ব্যাগে পুরে হোটেলে পাঠান। এই বয়সেও রান্নাবাড়ি তদারকি করেন এবং খদ্দেরদের পরিষেবার প্রতি গভীর নজর রাখেন। প্রমাণ সাইজের এক পিস চিতল মাছ ৩০০ টাকা বা সরষে-ইলিশ ওই টাকায় খেলে, কিন্তু আবার আসতেই হবে। ওদের পরোটা, চিকেন, মাটন ভোজনরসিকদের আকর্ষণ করে। শচীনবাবু যাযাবরকে একটা ব্র্যান্ডনেম দিতে সমর্থ হয়েছেন। প্রাক্তন ফৌজি তাই তাঁর জীবন ডিসিপ্লিনের চূড়ান্ত উদাহরণ। কিছুদিন আগে শচীনবাবুর সঙ্গে দিনবাজারে মাছ কাটানোর দোকানে দেখা হয়েছিল, বলেছিলাম, 'নিশ্চিন্তে সেঞ্চুরি পার করুন।' শুধু একটু হাসলেন।

বাইকের দাপট শুরু হওয়ার আগে থেকেই শহরের আশপাশে প্রচুর লাইন হোটেল বা ধাবা তৈরি হয়েছিল। বাইকবাজরা বন্ধু বা বান্ধবীদের বাইকে চাপিয়ে নিয়ে ধাবাগুলোতে আড্ডা জমায়। এর একটা বৈশিষ্ট্য চোখের সামনেই উন্মুক্ত রান্নাঘর। অর্ডারমাফিক খাবার তৈরি হচ্ছে। সারারাত ধাবাগুলো খোলা থাকছে। একসময় শুধুমাত্র পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য ধাবাগুলো তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন সর্বশ্রেণির মানুষের ভিড়। সামনেই দুর্গা পুজো। ডুয়ার্সে বেড়াতে গিয়ে কোথায় খাবেন, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

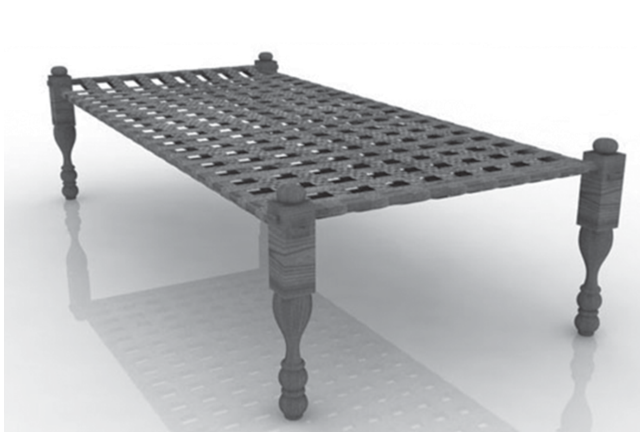

অগাস্ট মাসের শুরুতে এক বিকেলে চা খেতে ঢুকেছিলাম 'ঝাঝাঙ্গী' লাইন হোটেলে। ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ির মাঝে হাইওয়ের ধারে বিশাল ধাবা কয়েক বিঘা জায়গা জুড়ে। আসলে ঝাঝাঙ্গী একটা নদীর নাম। নদীর কাছে এই ধাবার নামও ঝাঝাঙ্গী। অতি অল্পভাষী একজন দশাসই চেহারার ম্যানেজার বসে ছিলেন। ব্যস্ত মানুষ— তবে তার মাঝে কথাও বলা যায়। আমি ম্যানেজারবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। বললাম, 'বহু মানুষ বা ভিন রাজ্যের ট্রাকচালক বলেছেন, এত বড় ধাবা সারা দেশে নেই। আমি একটি পাক্ষিক পত্রিকায় আপনার ধাবা নিয়ে লিখব। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বললাম, মালিকের নাম কী? উনি কোথায় থাকেন?' সামান্য বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'মালিকের নাম প্রদীপ চৌধুরী, শিলিগুড়িতে থাকেন। রাতে আসুন, উনার সাথে কথা বলুন।' আমি বললাম, 'এই ধাবার বয়স কত?' '৩০-৩৫ বছর হবে।' উত্তর দিয়ে উনি একদম চুপ। প্রশ্ন করেছিলাম, 'প্রতিদিন তিন শিফ্‌টে কতজন কাজ করে? মনে হয়, ৩৫-৪০ জন হবে?' উনি বললেন, 'দুই শিফ্‌ট, কতজন কাজ করে, তার ঠিক নেই।' আমি কর্মীদের তৎপরতা লক্ষ করছিলাম। যন্ত্রের মতো কাজ করছিল। তখন বোধহয় ছ'টা উনুন জ্বলছিল। ম্যানেজারের কাউন্টারে নানা সাইজের ঘিয়ের কৌটো, পেল্লায় সাইজের লাড্ডু, শুকনো খাবার, আচার, আরও কত কী বিক্রি করা হয়। বাইরে ছোটবড় গাড়ি মিলিয়ে ৫৭টি গাড়ি গণনার পর হাল ছেড়ে দিই। প্রচুর গাড়ি, গণনা সম্ভব নয়। পিছনে ধাবার জন্য কয়েক ট্রাক জ্বালানি কাঠ। তা ছাড়া ধাবার সমস্তরকম খাদ্যসামগ্রী বা কাঁচামাল ট্রাক ভরতি হয়ে আসে। গ্রাহক চালকদের স্নান করার জন্য তিন-চারটে বিশাল মাপের চৌবাচ্চা। ডজনকয়েক টয়লেট। অতীতে একসময় এই ধাবাতে আমিষ খাবার, এমনকি স্কচ-হুইস্কি পাওয়া যেত। শোনা যায়, নিকটবর্তী শহরের কোনও ডাকসাইটে ক্লাবের সঙ্গে চাঁদা নিয়ে ঝামেলায় বেশ কিছুদিন ধাবা বন্ধ রাখা হয়। অনেক মানুষ কর্মচ্যুত হয়। পরে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় আবার ধাবা চালু হয়, কিন্তু চিকেন, মাটন ও মাছ বন্ধ। মূলত নিরামিষ খাবার— তবে ডিম চালু আছে। আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি, এলাকার মানুষকে 'রোটি-তরকা' খাইয়ে একটা নতুন খানা কালচার আমদানি করেছিল ঝাঝাঙ্গী। এখন এই দোকানকে ঘিরে শতাধিক দোকান, গ্যাসের বড়ি থেকে মোবাইল ফোন— সবই পাওয়া যাবে রাস্তার ধারের অনুসারী দোকানগুলিতে। এই একটা ধাবার উপর নির্ভর করে যদি বলি পাঁচশত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, তবে কম বলা হবে।

ওই দিন ময়নাগুড়ি বাইপাসে 'আশীয়ানা' নামে নতুন একটা হোটেলে উপস্থিত হলাম। বিশাল বড় ক্যাম্পাস।

সামনে শতাধিক ছোট গাড়ি পার্ক করা যেতে পারে। সুদৃশ্য ও মনোরম একঝাঁক কটেজ, সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া সুদৃশ্য লন। সামাজিক অনুষ্ঠানের আদর্শ জায়গা। ২০১৪-র অক্টোবর মাসে উদ্বোধন। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। থাকার আটটি রুম আছে। সবচেয়ে কম দামি ঘরের ভাড়া ৯৯৯ টাকা এবং সবচেয়ে দামি ২৪৯৯ টাকা, সঙ্গে ১২ শতাংশ কর।

ময়নাগুড়ি মানে শিবক্ষেত্র। এখানেই জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির। ২৫ কিলোমিটার দূরে রামসাইতে গোরুমারা অভয়ারণ্যের প্রান্তে গন্ডারদের বিস্তীর্ণ বিচরণক্ষেত্র। আশীয়ানায় থাকা বা খাওয়াদাওয়া, পার্টি দেওয়া, ব্যাঙ্কোয়েট রুমে কনফারেন্সের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। রসিকজনদের জন্য পানশালাটি নাকি আকর্ষণীয়।

ম্যানেজার সন্দীপ মিত্র ঘুরে দেখালেন। প্রত্যক্ষভাবে ২৫-৩০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। মালিক কাজল চাকী প্রতিটি ছোটখাটো জিনিস নজরে রাখেন। সন্দীপ বলছিলেন, ওঁদের চিকেনের সমস্ত পদ এবং চাইনিজ খাবার অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভাত, স্যালাড, কাতলা মাছ এবং আলুভাজা-ডালসহ প্রতি প্লেটের মূল্য ৩৬০ টাকা। যদিও হোটেলটির সঙ্গে সরাসরি পর্যটনের কোনও যোগ নেই, তবে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেজ টুরের ব্যবস্থা করা হয়। ময়নাগুড়ি মানে শিবক্ষেত্র। এখানেই জল্পেশ মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির। ২৫ কিলোমিটার দূরে রামসাইতে গোরুমারা অভয়ারণ্যের প্রান্তে গন্ডারদের বিস্তীর্ণ বিচরণক্ষেত্র। আশীয়ানায় থাকা বা খাওয়াদাওয়া, পার্টি দেওয়া, ব্যাঙ্কোয়েট রুমে কনফারেন্সের জন্য ৮৩৪৮২৬৫১১১ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। রসিকজনদের জন্য পানশালাটি নাকি আকর্ষণীয়।

ময়নাগুড়ি বাইপাসে 'সো হো' একটি ছোট কিন্তু সাজানো হোটেল। এদের ফ্রায়েড রাইস, চিকেন ভর্তা অত্যন্ত ভাল মানের। পরিবারের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের দিকের রেস্টুরেন্টে একদিন যেতে পারেন। এলাকার স্থানীয় মানুষরা এত ভাল পরিষেবা দিতে পারে, ভাবাই যায় না।

ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির পথে তিস্তা ব্রিজ পার হলেই পরপর রাস্তার দু'দিকেই বেশ কয়েকটি ধাবা আছে। এদের মধ্যে হোটেল ডুয়ার্স, অন্নপূর্ণা বা চাঁদনী চক সবার পরিচিত। 'চাঁদনী চক' এদের পরিবারের সবচেয়ে নামী। সামনের ঘরগুলোয় সপরিবার খাবার ব্যবস্থা। ভিতরে ডজনখানেক কটেজ আছে। অনেক মানুষ একসঙ্গে পান-ভোজন করলেও কোনও কোলাহল নেই। ওয়েটাররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু দারুণ ভাল সার্ভিস দেয়। রাতে কটেজে বসে দূর থেকে ট্রেনের যাওয়া-আসা দেখা— জানালার আলো দ্রুত সরে যেতে দেখা অন্যরকম অনুভূতি। ওদের বাটার নান, ডাল মাখানি এবং মাটন কষা জিবে জল আনে। খাবারের দাম অনেকটাই সাধ্যের মধ্যে।

গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে রানিনগর পার হলেই এলাকার অভিজাত ধাবা 'মোটরিস্ট ইন'-এ ঢুকে সামনে তাকালেই উন্মুক্ত ঝকঝকে কিচেন। শেফদের ব্যস্ততা। মিষ্টি খাবারের ঘ্রাণে চারদিক ভরপুর। এখানে নানা ডিজাইনের, নানা সাইজের প্রায় পনেরোটা কটেজ আছে। তা ছাড়া সামনের ঘরে বসার ব্যবস্থা আছে। শিলিগুড়ি থেকে বহু মানুষ চল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এর পরিবেশ ও খাবার উপভোগ করার তাগিদে হাজির হয়। এসি ঘরগুলোতে অনেকে একসঙ্গে পানাহার করতে পারে। একটা ছোট ব্যাঙ্কোয়েটসদৃশ এসি ঘর আছে। কটেজগুলোর নির্মাণশৈলী তারিফযোগ্য। শিলিগুড়ির পথে আরও অনেকগুলো ধাবা রয়েছে, তবে মোটরিস্ট ইন পরিকাঠামো ও পরিষেবায় উঁচুতে অবস্থান করে। সমস্তরকম উত্তর ভারতীয় খানা উচ্চমানের। এই ধাবাটি নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তার সুনাম বজায় রেখেছে।

লাটাগুড়িতে দেবু মুখার্জির হোটেল 'গ্রীণ ভিউ' প্রায় ৩০ বছর ধরে একই রকম মান ধরে রেখেছে। একবার নবমী পুজোয় প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে দুপুরের খাবার পেয়েছি। পুরোপুরি বাঙালি খাবারের হোটেল। নিরামিষ রান্নার মান সর্বোৎকৃষ্ট। তা ছাড়া মাছ ও মাংসের নানা সুস্বাদু পদ ওঁদের ইউএসপি। ইদানীং দেবুবাবুর স্ত্রী কাছেই 'বাঙালিয়ানা' নামে খাবারের হোটেল চালাচ্ছেন। বেশ নামডাক হয়েছে। লাটাগুড়িতে 'রবিদার হোটেল' বা বাজারে 'বৌদির হোটেল'-এর বেশ পরিচিতি আছে।

একদিন মালবাজার বাস স্ট্যান্ডের উলটো দিকে 'বাপির হোটেল'-এর মালিককে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'যিনিই মালবাজারে আসেন, তিনিই কেন বাপির হোটেলে খেতে আসেন?' মালিক ওদলাবাড়ি নিবাসী বিশ্বজিৎ পাল জানালেন, 'আমি কোয়ালিটির সঙ্গে সমঝোতা করি না। খাবারের দাম হয়ত সস্তা নয়, তবে আজকের বাজারে ২৫০-৩০০ টাকায় যে খাবার আমি পরিবেশন করব তা গ্রাহকদের জিবে আজীবন লেগে থাকবে।' আরও জানিয়েছিলেন, প্রতিটি খদ্দেরকে তিনি নিজেই আপ্যায়ন করেন। জুন ২০০০ সাল থেকে তাঁর এই খাবারের হোটেল একই রকমভাবে পর্যটকের গন্তব্য। প্রয়োজনে বিশ্বজিৎবাবুকে ৯৭৩৩২৬৮১৯৩ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। হোটেলে ৭ জন কর্মী কাজ করেন।

মালবাজার থেকে শিলিগুড়ির পথে ওদলাবাড়িতে ঘিস নদীর ধারে রাস্তা থেকে নিচুতে 'লামা হোটেল' তিন প্রজন্ম হোটেল ব্যবসায়। তৃতীয় প্রজন্মের তরুণ তেনজিং নোরগে জানালেন, তাঁদের ধাবা ডুয়ার্সের সব থেকে পুরনো, পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। ওঁর দাদু হোটেলের স্থপতি। পরে তেনজিঙের পিতা পাশাং সেরিং চৌত্রিশ বছর হোটেল চালিয়েছেন। এখনও উনি হোটেলে এসে দেখাশোনা করেন। সে দিন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সামনের রাস্তা দৃষ্টি কিছুটা আটকালেও— বৃষ্টি-ভেজা হালকা মেঘের ফাঁকে নীল পাহাড় উঁকি মারছিল। প্রায় ২০-২৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। স্থানীয় মানুষরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের লামা বলে, যেহেতু তারা বৌদ্ধধর্মের মানুষ তাই এলাকার মানুষ নাম দিয়েছে 'লামা হোটেল'। এই হোটেলে বহুবার এসেছি, এদের চিকেনের পদ এবং নানা ধরনের পকোড়া খুব সুস্বাদু। ওঁদের জন্য একটা পরামর্শ, এত ভাল হোটেলের টয়লেটটিও ভাল হওয়া উচিত। ফোন নং- ৯৫৯৩২৮৫৮০৬।

এবার সেবক-করোনেশন ব্রিজ অতিক্রম করে সেবক বাজার। পুরনো 'গৌতম হোটেল' সর্বদাই খদ্দেরে গমগম করছে। তবে পাহাড় অশান্ত থাকায় সেই ভিড় নেই। টেরাসে বসে চায়ের গ্লাস হাতে দূরের তিস্তা নদী, পাহাড়, গাছগাছালি আকর্ষণ করবেই। ওঁদের আমিষ খাবার বেশ নামকরা। ওঁরা প্রায় ২০ জন মানুষের কর্মসংস্থান করেছেন। ডুয়ার্সের হোটেল এবং ধাবাগুলোতে এলাকার প্রচুর মানুষ কাজ পেয়েছে। সবাই চাইছে, পাহাড়ে শান্তি আসুক— তাহলেই পর্যটকের ঢল নামবে।

কোচবিহারের রাসচক্র, আলতাফ এবং প্রতিমার পিছন দিক

শারদ উৎসব সাঙ্গ হল। ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি পাঁচ দিন ধরে পুজো প্যান্ডেল হপিং করে মহোল্লাসে ঠাকুর দেখেছে ডুয়ার্সের মানুষ। সলসলাবাড়ি থেকে ভেটাগুড়ি, দোমোহানি থেকে ধুমচিপাড়া, বানারহাট থেকে মালবাজার— সব জায়গাতেই প্রতিমা দর্শনে ভিড় জমিয়েছে জনতা। পিছনের লোকের ঠেলা-গুঁতো খেয়েও লক্ষ্যে অবিচল থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে প্যান্ডেলের কারুকাজ, মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির অপার্থিব সৌন্দর্য। তারপর ফিরে গিয়েছে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু একটা কথা হলফ করে বলা যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা ঠাকুরের সামনেটাই শুধু দেখেছে। সেটা দেখতেই তো আসা। কিন্তু মায়ের পিছন দিক নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ। এটুকু পড়েই নিশ্চয়ই ভুরু ধনুক হয়ে উঠেছে পাঠকের। ও মা, এ আবার

কেমন অলক্ষুনে কতা গো! ঠাকুরের আবার পিছন কী!

আমরা মুচকি হেসে বলব, ইয়েস, আছে। জলকাদা ভেঙে ঠাকুরের পিছন দিকটায় কষ্ট করে একবারটি গেলে দেখতে পেতেন সেখানে বাঁশ আছে, কাঠের ঠেকনা আছে, ইতস্তত বেরিয়ে আসা খড় আছে, আর আছে খড়খড়ে লেপা মাটি। ঠাকুরের বড় করুণ দশা। লজ্জা ঢাকতে আর কিছু না হোক, সস্তা এক টুকরো কাপড়ও তাঁদের ওদিকে জোটে না। তবে চালার ঠাকুর হলে বাই ডিফল্ট বাঁচোয়া। আসলে যে নৈপুণ্যে নির্মিত হয় প্রতিমার প্রচ্ছদ, সেভাবেই তো নির্মাণ করা যায় তার ব্যাক কভারও। চন্দ্রের তেজে যদি দুর্গার স্তন হতে পারে, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ঊরু, তাহলে পৃথিবীর তেজে নিতম্ব হতে ক্ষতি কোথায়! দুর্গার ধ্যানেই তো বলছে, তিনি 'সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরম্'। তাঁকে তো সম্পূর্ণ করেই গড়ে তোলা যায়। সব দিক থেকে। ত্রুটিহীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর।

এই যে ধরা যাক দুর্গার হেয়ারস্টাইল, যাকে বলা হচ্ছে 'জটাজূটসমাযুক্তা', আমাদের নির্মাণে সেই কেশবিন্যাসও তো আংশিক। সামনে দু'-একটা অলকচূর্ণ

সাজিয়েই দায় সারেন মৃৎশিল্পী। কপালে দু'-একটা লকস, পাশ দিয়ে কার্লের ঢল নেমেছে। কিন্তু পিছনে গিয়ে দেখুন, এক্কেবারে টাক। মাঝে আবার মুকুটের আড়ালে ছাঁচের ফুটো। অথচ আমরা নিজেরা যখন পার্লারে যাই, তখন কিন্তু সামনে-পিছনে আয়না থাকা মাস্ট।

এখানেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ভাবের পুজো তো আমরা কবেই ছেড়েছি, আমাদের মূর্তিপুজোটুকুও ঠিকঠাক সৎ হবে না কেন? উমাকে বাপের বাড়ি এনে যে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির জগৎ আমরা তৈরি করি, বচ্ছরকার পাঁচ দিন তার ভিতর ডুবে থাকি, নিজস্ব সেই অনুভূতিকে আর-একটু নিষ্ঠায় রুচিসম্মত করে তোলার প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধতা নেই। আমরা অকল্পনীয় সব থিম কল্পনা করব। সাবেক রীতিকে বহন করে নিয়ে যাব সামনের দিকে। চড়া লাইটিং-এ মুড়ে দেব ময়নাগুড়ি থেকে মানিকগঞ্জ, হুসলুরডাঙা থেকে চড়কডাঙি। টুনি বা এলইডি দিয়ে মুড়ে দেব মণ্ডপ। আলোর রোশনাই থাকবে সামনের দিকে। বাজেটের সব টাকা ঢালব প্রতিমার সামনের দিকে। অথচ গ্রেনিচের ঠিক উলটো দিকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা বরাবর দৃশ্যমান থাকবে শুধুই নগ্ন মাটি। কেননা ওখানটা তো কেউ দেখতেই পাবে না। ধরে নেওয়া হয়, যা এক্সপোজড নয় তা স্রেফ উপেক্ষণীয়।

রাজা সুরথ আর সমাধি যখন নদীর ধারে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জগন্মাতার সম্যক দর্শনলাভ। 'সন্দর্শনার্থমম্বায়াঃ'। 'সম্যক' বিশেষণটি ভিড়ের একাকিত্বে আর আলোকসজ্জার অন্ধকারে আমরা বহুদিন হল হারিয়ে ফেলেছি। আসলে ষোলো আনার বায়না নিয়ে আমরা ঠাকুরকে আট আনা বানিয়েছি।

লক্ষ-কোটি বছরের অভিযোজনে আমাদের সামনে আর পিছনকে পিছন করে তুলেছে প্রকৃতি। সেই পশ্চাৎভাগে আরও কিছু ভ্যালু অ্যাড করে নিয়েছি আমরা। গ্রীবা আর খোঁপা নিয়ে আদিখ্যেতার কথা ছেড়ে দিন, সেই মাহাত্ম্য তো আছেই, স্টাইল স্টেটমেন্টে রীতিমতো ঝড় তুলেছে হিপ ক্লিভেজ। খোলা পিঠের ম্যাজিক রিয়্যালিজ্‌ম তো আছেই। টি-শার্টের পিছনেও ক্যাপশন লিখে ঘুরছে জনতা। অথচ যে দেবীকে নিয়ে মানুষের এত উন্মাদনা, যাকে ঘিরে এত উৎসব, তার বাকি আট আনার ব্যাকগ্রাউন্ড করে রেখেছে কদর্য। সেখানে ঠাঁই হয়নি এতটুকু নান্দনিকতার।

প্রাচীন গ্রিসের প্রবাদপ্রতিম ভাস্কর ছিলেন ফিডিয়াস। একের পর এক দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে তিনি প্রায় গ্রিসের বিশ্বকর্মা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এসব দেবদেবীকে তো তিনি চাক্ষুষ করেননি, তাহলে তিনি কীসের উপর ভিত্তি করে এঁদের নির্মাণ করেছেন? ফিডিয়াস বলেছিলেন, তিনি স্টুডিয়োতে জনা কুড়ি গ্রিক অ্যাথলিটকে নগ্ন করে বৃত্তাকারে ঘোরান। বৃত্তের কেন্দ্রে থাকেন তিনি। কর্মরত। তাঁদের দেহসৌষ্ঠব আর অপূর্ব অ্যানাটমিই তাঁকে ঈশ্বরের আন্দাজ দেয়। কিন্তু কেন বৃত্তাকারে ঘোরাতেন ফিডিয়াস? কেন একজন ভাস্করের দরকার হয় রিভল্‌ভিং প্ল্যাটফর্ম? কারণ সে তিনশো ষাট ডিগ্রিই নির্মাণ করতে চায়। সামনে আর পিছনে সে তুলে ধরে সমান ডিটেল। র‍্যাম্পে হাঁটা সুন্দরীর কথা একবার ভেবে দেখুন। তাঁরাও তো প্রথমে ক্লকওয়াইজ, তারপর অ্যান্টিক্লকওয়াইজ মোচড় দেন। তারপর থামেন। তারপর দুলকি চালে হেঁটে যান। কেননা যিনি সুন্দর, তিনি তিনশো ষাট ডিগ্রিই সুন্দর।

কেন একজন ভাস্করের দরকার হয় রিভল্‌ভিং প্ল্যাটফর্ম? কারণ সে তিনশো ষাট ডিগ্রিই নির্মাণ করতে চায়। সামনে আর পিছনে সে তুলে ধরে সমান ডিটেল। র‍্যাম্পে হাঁটা সুন্দরীর কথা একবার ভেবে দেখুন। তাঁরাও তো প্রথমে ক্লকওয়াইজ, তারপর অ্যান্টিক্লকওয়াইজ মোচড় দেন। তারপর থামেন। তারপর দুলকি চালে হেঁটে যান।

আমাদের পুজোর রীতিতেও এই 'প্রদক্ষিণ' অনিবার্য অঙ্গ। সেখানেও বামাবর্ত আর দক্ষিণাবর্তর প্রসঙ্গ। তার মানে দেবস্থানকে, স্বয়ং দেবতাকে ঘুরে ঘুরে উপাসনা করবে ভক্ত। কিন্তু আমাদের দুর্গাপ্রতিমায় সেই রাউন্ড আপ থাকে না। সেখানে সে শুধু সামনে থেকেই দেখার বস্তু। ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হয় বিসর্জনের দিন। ডুয়ার্সের সমস্ত পুজো কমিটির ছোটবড় পুজো ধীরে ধীরে নিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে চলে। আমরা ভক্তের দল পথের দু'পাশে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে স্থির দাঁড়িয়ে থাকি। পুজোর তিন দিন জাঁকজমকে আড়াল করে রাখা প্রতিমার বাঁশ, কাঠামো, খড়, মাটি ভক্তের কাছে উদোম হয়ে যায়।

খানিক প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। দুর্গা উৎসব সমাপন মানে রাসপূর্ণিমার সময় সমাগত। কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে রাসপূর্ণিমা, বিশ্রাম নেবার উপায় নেই কোচবিহারের আলতাফ মিঞার। তিন দশকের বেশি সময় থেকে এই সময়টা আলতাফ ব্যস্ত থাকেন রাসচক্র তৈরির কাজে। গত বছর তিনিই রাসচক্র তৈরি করেছিলেন। এবারও লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে এই কাজ তাঁরই করার কথা। কোচবিহার শহর লাগোয়া হরিণচওড়ার তোর্সার বাঁধের পাড়ের বাড়িতে রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত টানা ওই কাজ চলবে। অর্থাৎ ফি-বছরের মতো এবারেও আলতাফের তৈরি রাসচক্র ঘুরিয়ে সূচনা হবে রাস উৎসবের।

ইতিহাসের গবেষকদের মতে কোচবিহারের রাসমেলা দু'শো বছরেরও বেশি প্রাচীন। ১৮১২ সালে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ভেটাগুড়িতে রাসমেলার সূচনা করেন। ১৮৯০ সালে কোচবিহারের বৈরাগী দিঘির পাড়ে মদনমোহন তৈরির কাজ সংলগ্ন এলাকায় বসছে। রাসপূর্ণিমায় বিধি মেনে বিশেষ পুজো করে সূচনা হয় রাস উৎসবের। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলাশাসক দিনভর উপোস করে পুজো করেন। তিনিই সবার আগে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করেন। ফি-বছর ওই সূচনাপর্বের পর রাসচক্র ঘোরাতে মদনমোহন মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে।

একসময় আলতাফের দাদু পান মহম্মদ মিঞা, বাবা আজিজ মিঞা ওই কাজ করতেন। এখন সেই ভার আলতাফের হাতে। দেবোত্তর অস্থায়ী কর্মী হিসেবে প্রায় এক দশক কাজ করছেন আলতাফ। কিন্তু লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন হলেই রাসচক্র তৈরির কাজ শুরু করতে ভুল হয় না আলতাফের। ছেলে আমিনুর হোসেন, স্ত্রী বাবলিও বাঁশ কাটা, কাগজ কাটা থেকে নানাভাবে রাসচক্র তৈরিতে সাহায্য করেন।

কোচবিহারের রাস উৎসব দেখার সুযোগ হয়েছে বেশ কয়েকবার। যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন, তাঁরা জানেন, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কোচবিহারের রাসমেলার এই রাসচক্র দর্শনার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। উৎসবের সূচনার পর তো বটেই, মেলায় আসা মানুষজনও ওই রাসচক্র ঘোরাতে ভিড় জমান। এই কলমচিও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন কয়েকবার। বংশানুক্রমিকভাবে আলতাফের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে রাসচক্র তৈরির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শুনেছি, আলতাফ অত্যন্ত যত্ন করে নিয়ম মেনে যেভাবে রাসচক্র তৈরির কাজ করেন তা ভীষণ গর্বের। এ সত্যিই এক অসাধারণ সম্প্রীতির নজির।

অবহেলার পুরনো পাঁকে পদ্ম ফুটবেনা তো?

আমার কৈশোরের সোনালি স্মৃতিতে যে মানুষটি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন, কোচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর। তিনি ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। শিক্ষায়-দীক্ষায়, মননে, চলনে-বলনে তিনি ছিলেন অনন্য। ঠাকুমার ঝুলিতে পড়া রূপকথার রাজপুত্রর মতো এই সৌম্যদর্শন রাজপুরুষকে দেখে শৈশবের আমি যেন কোনও এক স্বপ্নলোকে হারিয়ে যেতাম।

তিনি অথবা তাঁর পূর্বজরা যেমন সুদর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন, তেমনই নয়নাভিরাম সুন্দর করেই সাজিয়ে-গুছিয়ে গড়ে তুলেছিলেন রাজনগর কোচবিহারকে। শৈশবের সেই সুন্দর মনোরম শহরটিকে আজও আমি ঘুমের মধ্যে দেখতে পাই। সেই শহরের বিজন পথে এখনও আমি হেঁটে বেড়াই; রাজার বাগান থেকে ফুল চুরি করে দৌড়ে পালাই। কলাবতী, বেল, টগর, গন্ধরাজে ভরে উঠত ফুলের সাজি। শুধু ফুল নয়, গোলাপজাম, ফলসা, বকুল, পানিফল, জলপাই, করমচা, লিচু আর মিষ্টি তেঁতুল, ফুলের আড়ালে আর পকেটে পকেটে পাচার হয়ে যেত রাজার বাগান থেকে।

বছরের প্রায় ন'মাসই মহারাজা থাকতেন বিদেশে। যখন তিনি রাজনগরে আসতেন, তখন চারদিকে যেন সাজো সাজো রব পড়ে যেত। রাজবাড়ির সিংহদুয়ার খুলে যেত। গেটের দু'পাশে সশস্ত্র প্রহরী। আর রাজা যতদিন থাকতেন, পতাকা উড়ত রাজপ্রাসাদে। কালো ঘোড়ায় চেপে যখন তিনি প্রাসাদ থেকে ময়দানে আসতেন পোলো আর গল্ফ খেলতে, রেলিং-এর বাইরে তখন রাজভক্ত প্রজাদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কালের ফেরে রাজমুকুট হারালেও তাঁর গরিমা ছিল চিরন্তন।

সাজানো শহর। পিচ-ঢালা রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে পায়ে চলা পথ। পথের ধার ঘেঁষে পরিকল্পিত নর্দমা। মোড়ে মোড়ে আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন, পরিস্রুত পানীয় জলের কল। শহরে আগুন লাগলে নেবানোর জন্য হাইড্রেন্টের ব্যবস্থা, এমনকি পশুপাখিদের পানীয় জলের সংস্থান করতে আয়তাকার চৌবাচ্চাও নির্মিত হয়েছিল রাস্তার ধারে ধারে। আর ছিল ছোটবড় ৩৪টি সরকারি জলাশয়। ইংরেজ স্থপতি কর্নেল হটনকে দিয়ে বিদেশি নকশায় গড়ে তোলা হয়েছিল আধুনিক কোচবিহার শহর। এই শহরের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর।

১৯৪৯-এ ভারতভুক্তির পর ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি স্বাধীন করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার রাতারাতি একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। পাকিস্তানের সঙ্গেও

কোচবিহারের কড়চা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

নয়, আসামের সঙ্গেও নয়, মূলত প্রজাবৎসল মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর রাজ্যের প্রজাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও নিরাপদ করতে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। একটি সাজানো-গোছানো সুন্দর শহরসহ তাঁর সাধের কোচবিহার তিনি তুলে দিয়েছিলেন ভারত সরকারের হাতে।

গোটা শহরের জনসংখ্যা তখন বড়জোর ছ'-সাত হাজার বা কিছু বেশি। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, জেলখানা, বাজারহাট, এমনকি সামরিক ছাউনি পর্যন্ত— পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামোযুক্ত একটি শহর তথা রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন মহারাজা। শুধু তা-ই নয়, আদর্শবান মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ অন্তর্ভুক্তির সময় তাঁর রাজকোষে গচ্ছিত দু'কোটি টাকাও ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য। যে টাকায় গঠিত হয়েছিল কোচবিহার উন্নয়ন তহবিল। যার লভ্যাংশ দিয়ে আজও চলে এই জেলার উন্নয়নের কাজ।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে কলকাতা তথা গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত উন্নয়নের কাজ। ১৯০১ সালেই গোটা দেশের রেল মানচিত্রে জায়গা করে নেয় কোচবিহার। স্থাপিত হয় কোচবিহার রেল স্টেশন। ১৯০৭ সালের মধ্যে কোচবিহার স্টেট রেলওয়েজ মোগলহাট থেকে খোলটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অধুনা বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা তথা গোটা দেশের সঙ্গে কোচবিহারের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় বিগত শতাব্দীর একদম গোড়ায়।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করে কোচবিহার স্টেট রেলওয়েজ প্রথম বছরই মুনাফা করে ২৭ হাজার টাকা। কোচবিহার থেকে সন্ধে ৭টায় মিটার গেজ ট্রেন রওনা দিয়ে পার্বতীপুর জংশন থেকে দার্জিলিং মেল ধরে পরদিন কাকভোরে পৌঁছে যেত কলকাতায়। আর আধুনিক সভ্যতার মূল জাদুকাঠি বিদ্যুৎ কোচবিহারে পৌঁছে গিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

১৯৩০ সালের পরপরই চালু হয়ে যায় কোচবিহার বিমানবন্দর। প্রথমে মহারাজাদের নিজস্ব বিমান ওঠানামা করত এই বিমানবন্দরে। ১৯৪০/৪১ সাল থেকে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালু হয়ে যায় কোচবিহার-কলকাতার মধ্যে। ১৯৫৪ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় কোচবিহার শহরের

সাগরদিঘি, কোচবিহার

কেরালা টুর ২০১৭

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে
১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

মানচিত্রটি আমূল পালটে যায়। শহরের পশ্চিম আর দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকার এক বর্ধিষ্ণু জনপদ চলে যায় তোর্সার গর্ভে। মন্দির-মসজিদ, বসতবাড়ি, মাঠঘাট ভাঙতে ভাঙতে নদী পৌঁছে যায় মহারাজাদের সমাধিক্ষেত্র কেশবাশ্রমের দোরগোড়ায়। উদ্‌বিগ্ন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বন্ধুপ্রতিম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তোর্সার ভাঙন থেকে শহরকে বাঁচাতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজাসাহেবের বার্তা পেয়ে পণ্ডিত নেহরু সশরীরে চলে আসেন কোচবিহারে। তোর্সা রেল সেতু থেকে খাগড়াবাড়ি পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ মঞ্জুর হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়ে যায়। দ্রুত সম্পন্ন হয় বাঁধ নির্মাণের কাজ।

শহর কোচবিহার আকারে ছোট হয়ে যায় অনেকটা। এদিকে শুরু হয়ে যায় তদানীন্তন পাকিস্তান থেকে উদ্‌বাস্তু আগমনের অবিরাম স্রোত। শহরের জনসংখ্যার দ্রুত বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কলকাতাকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় উন্নয়নক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলে উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে আমাদের কপাল পুড়তে শুরু করে। কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট পেরিয়ে বামফ্রন্ট আমলেও শহর কোচবিহার বঞ্চিতই থেকে যায়। ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়ন প্রকল্পের টাকায় একটি বাজার, একটি পান্থনিবাস আর দু'-একটি অর্ধসমাপ্ত বাস টার্মিনাস নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয় বাম-সরকার। এদিকে জনগণের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে গিয়ে শুরু হয়ে যায় শহরের রাস্তাঘাট দখলের প্রতিযোগিতা।

শহরের ফুটপাথগুলো একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যায়। নাগরিকদের চলার পথ রুদ্ধ করে ফুটপাথের উপর গজিয়ে উঠতে শুরু করে অসংখ্য দোকানপাট। শহরের ব্যস্ততম রাজপথ সুনীতি রোড, বিশ্বসিংহ রোড, নৃপেন্দ্রনারায়ণ রোড, কেশব রোডে ফুটপাথ দখলের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, এখন তা পাকা রাস্তায় এসে ঠেকেছে। শহরের ফুসফুস সাগর দিঘি। সেই দিঘির সৌন্দর্যায়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বাম-আমলে। নিট ফল শূন্য। কংক্রিট আর লোহার রেলিং দিয়ে দিঘির বাতাসকে রুদ্ধ করা হয়েছে। সবুজ ঘাসের নর্দমা বুজিয়ে দিয়ে ফুটপাথ গড়ে তোলা হল অর্বাচীনের মতো। এখন একটু বৃষ্টিতেই সাগর দিঘির পাড় জলমগ্ন হচ্ছে। ফুটপাতের নীচ দিয়ে নর্দমাটিকে টিকিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই এমনটা হত না।

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদল হল, কিন্তু এই শহরের দৈন্যদশা একটুও কমল না। সাগর দিঘির সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব বর্তমানে ভিনদেশি এক মুকুটবাবুর উপর। তিনি বা তাঁরা জলে কিছু নৌকা ভাসালেন আর দিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ঝুপড়ি গড়ে তুলে চূড়ান্ত দৃশ্য দূষণ ঘটালেন। পরিযায়ী পাখিরা সাগর দিঘি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিয়ম করে সংবাদপত্রে জনগণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! জেলা প্রশাসনের চোখে ঠুলি আর কানে তুলো। গোটা শহর ঢেকে গিয়েছে শুধু ফ্লেক্স আর হোর্ডিং-ব্যানারে। দৃশ্য দূষণ গোটা শহর জুড়ে। পুরসভার ভাঁড়ারে কিন্তু এক পয়সাও জমা পড়ছে না। অথচ শহরটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। ভূমিকম্পপ্রবণ এই শহরে একের পর এক বহুতল গজিয়ে উঠছে। অথচ সেগুলোতে কার পার্কিং-এর কোনও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। পুরসভা থেকে কোনও অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে সেগুলোর নকশা মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি তৈরির পর নিজের বাড়ির সামনের ড্রেন দখল করে ইচ্ছেমতো ফুটপাথগুলো উঁচু করে তোলা হচ্ছে। বৃষ্টির সময় রাস্তার জল গড়িয়ে নর্দমায় পড়ার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। তাই প্রতি বছরই রাস্তা ভাঙছে। কোটি টাকা খরচ করে তৈরি 'ম্যাস্টিক রোড'ও ভাঙন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পূর্ত দপ্তর বা পুরসভার নিদ্রাভঙ্গ কবে হবে, সেটাই এখন দেখার। শহরের পথঘাট গতিধারার গতিতে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

জবরদখলের ফলে একদিকে শহরের রাস্তাঘাট ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে আর অন্য দিকে বাস-অটো-টোটোর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। প্রতিদিন দিনের ব্যস্ততম সময় শহরতলি, গ্রামগঞ্জ থেকে অসংখ্য অটো-টোটো, বেআইনি ভুটভুটি অবাধে শহরে ঢুকছে। সংকুচিত রাস্তায় সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। গোটা শহর থমকে যাচ্ছে। আসলে এই শহরের অভিভাবক বলে কেউ নেই। 'বাউদিয়া ছাওয়ার' মতো শহর কোচবিহার চলছে; দুর্গতিও অশেষ।

রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছু নতুন জেলা গঠিত হয়েছে। আমাদের উত্তরবঙ্গেও নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন জেলাগুলোর পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, হবেই। কিন্তু এই রাজনগর কোচবিহারকে গড়ে তুলতে বিগত কোনও রাজ্য সরকারের সামান্যতম অর্থও খরচ করতে হয়নি। কেননা রাজার শহর কোচবিহার অথবা এই জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রশাসনিক পরিকাঠামো রাজ-আমলেই তৈরি ছিল। তাই এই চিরবঞ্চিত কোচবিহার সরকারি করুণার মুখাপেক্ষী নয়। রাজধানী কলকাতার সব চেয়ে প্রান্তিক সীমান্ত-ঘেঁষা সংকটময় এই কোচবিহার তার অতীত গরিমারক্ষায় ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিদার। রাজনগরের জলাশয়গুলোতে কিন্তু ইতিমধ্যেই পদ্ম ফুটতে শুরু করেছে। তাই সাধু সাবধান!

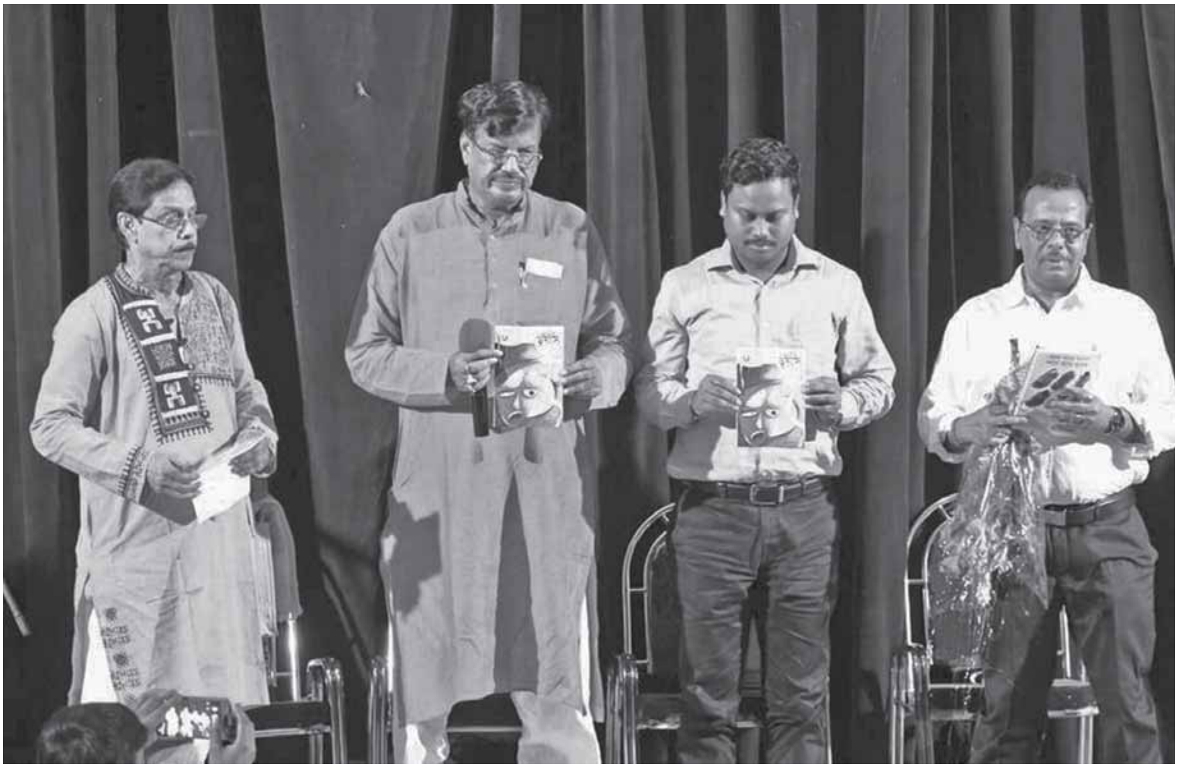

স্মরণিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাঁ দিক থেকে পূর্বাচল দাশগুপ্ত, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় ও 'এলিট শু' কোম্পানির কর্ণধার মৃদুল ভৌমিক।

চালু উত্তরের থিয়েটার মরশুম

কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল

টানা একমাস উৎসবের ধকল সয়েও, ক্লান্ত মধ্যবিত্ত তার ফাঁকা পকেট উপেক্ষা করেও হলে এসেছে— ফলে আবার প্রমাণ হয়েছে তার নাট্যপ্রেম শত ঝঞ্ঝাতেও অটুট। উত্তরে শুরু হয়ে গিয়েছে থিয়েটার যজ্ঞ। সূচনা ২৬ অক্টোবর কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে। কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল-এর উদ্বোধন হল স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামী, জেলা শাসক কৌশিক সাহা, পুরপ্রধান ভূষণ সিং ও অন্যান্য গুণীজনের হাত দিয়ে। প্রথম দিন শিলিগুড়ির নতুন দল 'প্যাশনেট পারফরমার' এবং জলপাইগুড়ির পুরনো দল 'বান্ধব নাট্য সমাজ' পরিবেশন করলেন তাঁদের প্রযোজনা। অতীব দুঃখকথা কিংবা বিপ্লবের গৌরবগাঁথা কোনওটাই আজকের সমস্যাক্লিস্ট মানুষ নিতে চায় না, তবু

সব্যসাচী চক্রবর্তীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক মিহির গোস্বামী

বটতলা, ঢাকা নাট্য দলের হাতে শুভেচ্ছাপত্র তুলে দিচ্ছেন মৃদুল ভৌমিক

কোচবিহারের দর্শক অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন প্রথমে আয়োজক দল মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের নাটক ‘ডার্করুম’ এবং পরে মালবাজারের দল ‘মাল অ্যাক্টোওয়ালা’-র ‘বৃদ্ধাশ্রম’ ভাবনায় অনেকটাই এক— প্রজন্মের লড়াই ও টানাপোড়েন, যা দর্শকের স্বাভাবিক পছন্দের।

তৃতীয়দিন দর্শকের জন্য ছিল প্রাণখোলা হাসির আয়োজন, সৌজন্যে ‘চার্বাক’ প্রযোজিত অরিন্দম গাঙ্গুলি পরিচালিত নাটক ‘চিটেগুড়’। এদিন ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় একটি বিশেষ স্মারক নাটক সংকলন। প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় ও পৃষ্ঠপোষক সংস্থা ‘এলিট শু’ কোম্পানির কর্ণধার মৃদুল ভৌমিক। ৫০ টাকা দামের বইটি টিকিট কেটে ঢোকা দর্শক পেয়েছেন বিনামূল্যে। ম্যাগাজিন স্টল বা আসন্ন বইমেলার স্টলেও মিলবে এই সংকলন।

শেষ দিন রীতিমত মঞ্চ কাঁপালেন বাংলাদেশের ‘বটতলা ঢাকা’ দল। তাঁদের ‘ক্রাচের কর্ণেল’ অভিনয়ে ও আঙ্গিকে মুগ্ধ করেছে দর্শককে। যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ইতিহাস এপারের বঙ্গসন্তানদের অজানা রয়ে যাওয়ায় নাটকের বিষয় অনেককে আকৃষ্ট করতে পারেনি বলে মনে হয়েছে। তবে ভালো-মন্দ টক-ঝাল সব মিলিয়ে কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল-এর মধ্যে দিয়েই এ মরশুমের ডুয়ার্সব্যাপী নাট্য উৎসবের শুভ মহরত হল বলা চলে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

পাতাকুঁড়ির অভিনব উদ্যোগ

সত্যিই সেই সন্ধেটা আর পাঁচটা সন্ধের থেকে ছিল একদম আলাদা। কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে ৩ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল, আপাতদৃষ্টিতে তাকে অন্য সব অনুষ্ঠানের থেকে আলাদা করার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু সে দিন ওই মঞ্চে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। পরিচিত গায়ক-গায়িকাদের পাশাপাশি সে দিন নৃত্যে, অভিনয়ে যাঁরা মঞ্চ ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন যৌনকর্মী অথবা তাঁদের সন্তান। এঁদের বাড়ির থেকে মাটি না এলে মায়ের আরাধনা পূর্ণ হয় না অথচ এঁদেরই সমাজে কোনও স্থান নেই। অসম্মান আর অবজ্ঞাকে নিত্যসঙ্গী করে বেঁচে থাকেন এঁরা। যৌনকর্মী হিসাবে শ্রমিকের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলছে এঁদের লড়াই। ‘দুর্বার’ এঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবরণ, প্রদীপ প্রজ্বলন। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং, সদর হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব বর্মন, ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য প্রমুখ। কোচবিহার কোতোয়ালির আইসি সমীর পাল এবং টাউনবাবু সোনম মহেশ্বরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গণেশবন্দনা দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। কলকাতার যৌনকর্মীদের সন্তানসন্ততিদের নিজস্ব সংস্থা ‘কোমল গান্ধার’ পরিবেশিত নৃত্য কোলাজ ‘দামিনী’ দর্শকদের মুগ্ধ করে। সংগীত পরিবেশন করেন অর্ক মহলানবিশ, প্রজ্ঞামিতা সরকার এবং বাসবদত্তা চক্রবর্তী। আর ছিল ‘কোমল গান্ধার’-এর একটি নাটক।

সেই সন্ধ্যায় একক নৃত্যে দর্শকদের মন জয় করেছে কোচবিহারের যে ছেলেটি, তার নাম শুভ। সে-ও এক যৌনকর্মীরই সন্তান। কার কাছে নাচ শেখে জানতে চাইলে, শুভ লাজুক হেসে বলে, নাচ তো টিভিতে দেখে দেখে শেখা। এ দিন কোচবিহারের প্রিয়গঞ্জ কলোনির যৌনকর্মী রেখা, ছবি, গায়ত্রী, বেলাদের দিয়ে ‘অন্য পৃথিবী’ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। দেবব্রত আচার্য এবং বৈশালী দাস নিজেদের কাঁধে এই যৌনকর্মীদের নিয়ে অভিনয় করানোর গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। নাট্যকার এই নাটকে তুলে এনেছিলেন তাঁদের জীবনের গোপন ব্যথাকে, নির্মম সত্যকে। বৈশালী দাসের কথায়, ‘নিজেদের ডায়ালগ মুখস্থ করাটা ছিল ওদের কাছে খুবই দুরূহ ব্যাপার। অনেকে তো ডায়ালগ রেকর্ড করে নিয়ে হেডফোন দিয়ে শুনে শুনে মুখস্থ করেছে নিজেদের পার্ট।’

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা অর্ক মহলানবিশ জানান, ‘এ বছরই প্রথম এই কলোনির ভিতরেই যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে পালন করা হয়েছিল বসন্ত উৎসব। পরবর্তীতে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। দুটো অনুষ্ঠানেই বাচ্চাদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। এদের অনেকেরই দারুণ প্রতিভা। তাই এদের বাইরে আনাটা খুবই জরুরি। ‘পাতাকুঁড়ি’ সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা চাইছিলাম, আমরা যারা শিল্পী, এদের সঙ্গে এক মঞ্চ ভাগ করে নিতে। যাতে এই ‘আমরা-ওরা’র ব্যবধানটা মুছে যায়।’ অর্কবাবু বলেন, ‘আজ সকলে এক মঞ্চ শেয়ার করে আমরা এই বিভেদ কিছুটা হলেও মুছতে পেরেছি।’ আর কলকাতায় এ ধরনের অনুষ্ঠান হলেও উত্তরবঙ্গে এই প্রথমবার এ ধরনের কোনও অনুষ্ঠান হল বলেও তিনি জানান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

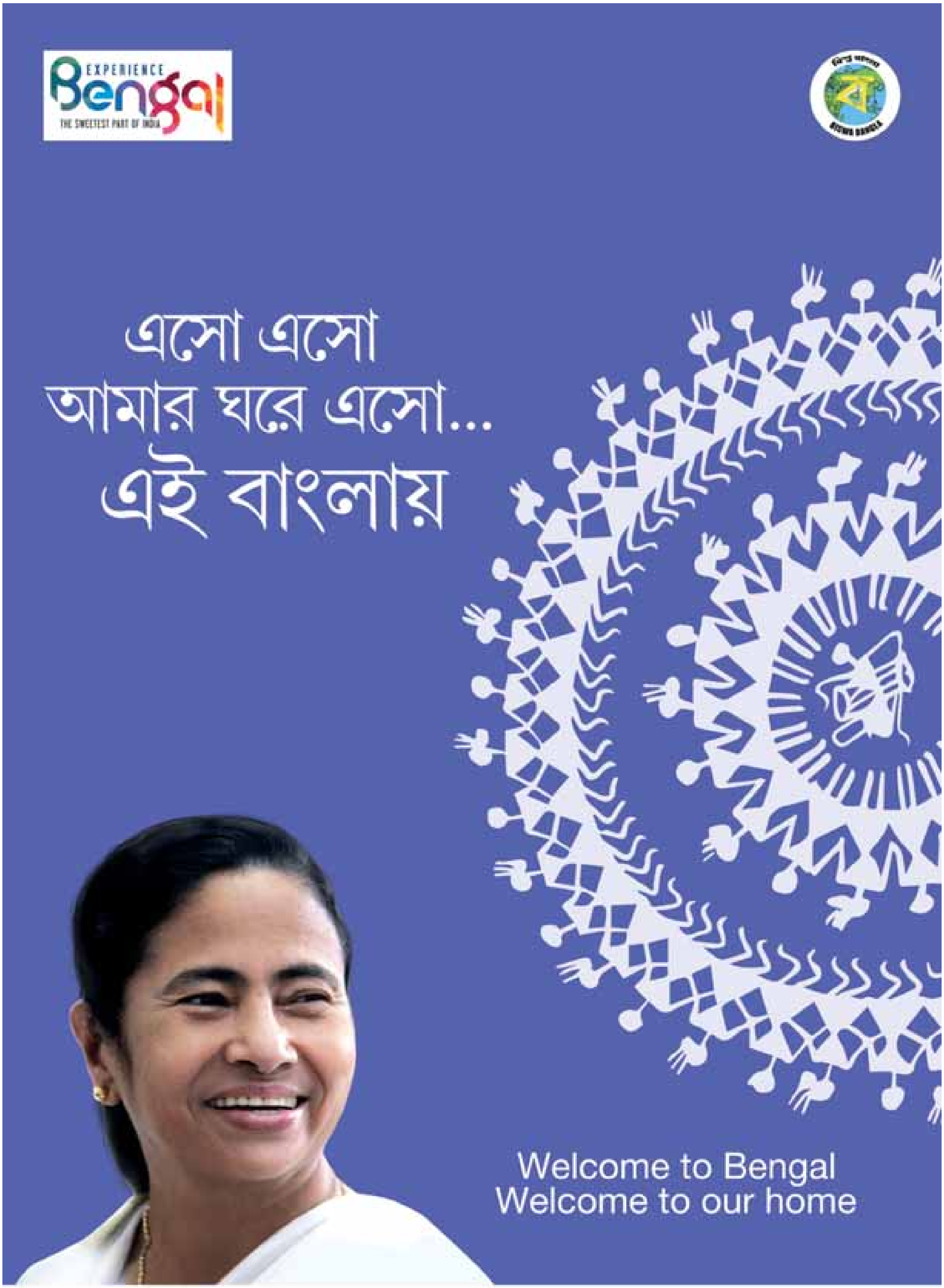

WEST BENGAL TOURISM
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-13 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

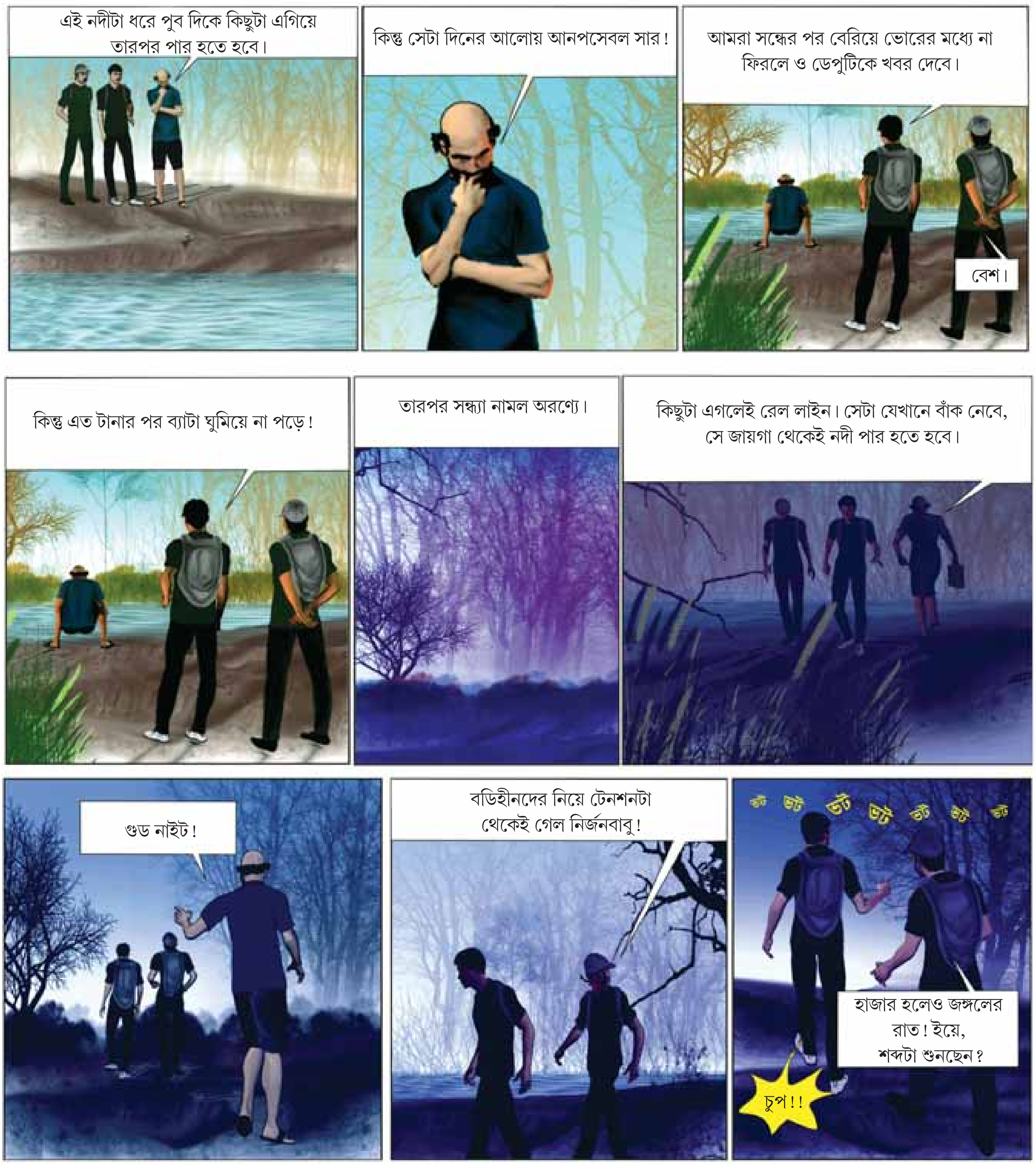

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.